শুধু তোমারি তরে

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

—প্রাপ্তিস্থান—

আর কে শীল

১৩, কলেজ রো কলিকাতা-৯

প্রকাশ করেছেন :

ঋতেন্দ্রকুমার শীল
'পর্ণ কুটীর'
৬, কামারপাড়া লেন,
বরাহনগর।

মুদ্রণ করেছেন :

গোপীনাথ চক্রবর্তী
অবলা প্রেস
১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

শুভ ২৫শে বৈশাখ '৬১

প্রচ্ছদপট শিল্পী :
৺পূর্ণ জ্যোতি ভট্টাচার্য

—শুধু তোমারি তরে

জায়গাটার আসল নাম নাই বললাম, ধরুন হলদি-ডাঙা। গ্রামের পশ্চিম পাড় ঘেঁসে মরা-হাজা যে নদীটা বাঁক নিয়ে দক্ষিণ-মুখো চলে গেছে, সেই রুপাই নদীপ যখন জলে টল্ টল্ করত তখন একটা বন্দরও ছিল এখানে। এখন কিন্তু হলদিডাঙার সেদিন আর নেই। তবু অর্ধেকের ওপর গ্রামটা এখনও আধা-জঙ্গল হয়েই আছে। আর পশ্চিম দিকটা ন্যাড়া মাঠ।

রোদে-পোড়া এই ন্যাড়া মাঠেরই বুক লেপটে আছে মরা-হাজা রুপাই নদী বছরে শুধু দু'টা মাস রুপাই নদী ছল্‌ছলিয়ে ওঠে। শাওন ভাদোতে যখন দূর-পাহাড়ের মাথার গেরুয়া রঙের ঢল নামে।

এবার ঠিক এই সময়ের কিছু পরে, অর্থাৎ হেমন্তের গোড়ায় গিয়ে পড়েছিলাম হলদিডাঙা গাঁয়ের এই রুপাই নদীর তীরে। পাহাড়ী ঢল তখন অনেকখানি সরে গেছে। সেই বৃত্তান্তই শোনাচ্ছি। যে দলের সঙ্গে গিয়েছিলাম, তারা সবাই ফিল্ম জগতের হোমরা-চোমরা। একমাত্র আমিই হংসমধ্যে বকো যথা। যাওয়া হয়েছিল 'নিশীথিনী' নামক একখানি ভৌতিক ছবির বহির্দৃশ্য তোলবার জন্যে কিন্তু কে জানত যে নকল ভূতের ছবি তুলতে গিয়ে একেবারে আসল ভূতের সঙ্গে ইন্টারভিউ হয়ে যাবে!

দৃশ্যটা হচ্ছে প্রেতিনী প্রিয়া নিশীথ রাত্রে নায়ককে ডাক দিয়েছে সেই ডাকে নায়ক নির্জন নদীতীরে একা খুঁজে বেড়াচ্ছে তার ছায়া প্রিয়াকে। রাতের দৃশ্য নাকি পড়ন্ত রোদে তুললেই ভাল হয়—অবশ্য বিশেষ 'ফিল্‌টারের' সাহায্যে। সুতরাং ক্যামেরা ইত্যাদি নিয়ে আমরা যখন 'লোকেশনে' পৌছলাম, তখন বেলা ঢলে পড়েছে। 'লোকেশন' মনে হচ্ছে সেই ন্যাড়া মাঠের কোল ঘেঁসে রুপাই নদীর একটা ধ্বসে যাওয়া বহু পুরানো ঘাট। স্থানিয় লোকেরা একে বলে 'সতী বউয়ের ঘাট'।

শ' দেড়েক গজ দূরে ছোটখাট একটা ঢিলার ওপর দাঁড়াল ক্যামেরা। আর ক্যামেরার চার পাশে আমরা। রুপাই নদীর ভাঙা ঘাটের ওপরে একা একা ঘুরে বেড়াতে লাগল ছবির নায়ক। মাথায় এলোমেলো রুক্ষ চুল; মুখেও এলোমেলো পাতলা দাড়ি। জামা-কাপড় ছেঁড়া, ধূলায় ধূসর পা। চোখে অস্বাভাবিক দৃষ্টি। আর মুখে মাঝে মাঝে গলা-কাঁপান ডাক, 'লতা-া-া-া…
(আওয়াজটা অবশ্য পরে রেকর্ড করে নায়কের মুখে বসানো হবে)

মরা নদীর ভাঙা ঘাট, পড়ন্ত বেলার লাল আলো, অপঘাতে মরে যাওয়া প্রিয়ার উদ্দেশে উদাসী নায়কের ডাক—সব মিলিয়ে মন্দ লাগছিল না। নায়কের ব্যথায় মনটা ভিজে উঠেছিল। এমন সময়ে গোটা দৃশ্যটাই বেয়াড়া রকম পাল্‌টে গেল। ভাবের আতিশয্যে শ্রীমান নায়ক লতা লতা বলে ডাকতে ডাকতে ভাঙা ঘাটের মাথায় সেই যে মুখ থুবড়ে পড়ল, ওঠবার আর নামটি নেই।

একমিনিট, দুমিনিট, পাঁচ মিনিট যায়, নায়ক তবু ওঠে না। মনে হল, ভারি রিয়ালিষ্টিক অভিনয় করছে তো ছোকরা। ডিরেক্টর আর তাঁর সহকারী ঢিলা ছেড়ে এগিয়ে গেলেন ঘাটের দিকে। পিছন পছন আমি। গিয়ে দেখি, ও হরি এ তো রিয়ালিষ্টীক অভিনয় নয়, এ যে স্রেফ দাঁতকপাটি। দাঁতি লেগে নায়ক অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

ডিরেক্টর নায়কের কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিলেন কয়েকবার। নায়কের চোখ তবু খুলল না। বললাম, মুখে জলের ঝাপটা না দিলে জ্ঞান হবে না।

জলের সন্ধানে ডিরেক্টর এবং সহকারী ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে কয়েক ধাপ নেমে গেলেন। কিন্তু দু-তিন ধাপ মাত্র নেমেই খাঁটি য়্যাংলো স্যাক্সন উচ্চারণে 'মাই গড' বলে চিৎকার করে উঠে এলেন ডিরেক্টর। আর পরমুহূর্তেই খাঁটি হিন্দুর মত 'রাম রাম, বলতে বলতে সিড়ি দিয়ে তরতরিয়ে উঠে এসে ঢিলার দিকে চো চাঁ ছুট।

সহকারীটিও আমায় ফেলে যাবেন না স্যার বলতে বলতে প্রভুর পিছু নিল।

ব্যাপার কি? মিনিটখানেক হতভম্ব হয়ে রইলাম। আমার পায়ের কাছে হতচেতন নায়ক মৃগীর মতন তখনও মুখ দিয়ে গাঁজলা ভাঙছে। ভয় হল, মুখে-চোখে জলের ঝাপটা না দিলে নায়কের হয়ত পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটবে। কিন্তু ওরা দুজন জল আনতে গিয়ে কাঠবিড়ালির মতন হঠাৎ অমন ছুটে পালাল কেন?

কারণটা জানতে অবশ্য দেরী হল না। জলের আশায় সিঁড়ির গোটা চারেক ধাপ নামতেই পা দুটো কে যেন আমার পেরেকে ঠুকে পুঁতে দিল। সোজা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘাটের সব শেষের শ্যাওলা-সবুজ ধাপের ওপর উপুর হয়ে শুয়ে আছে একটি নারী! নিতম্ব থেকে পা অবধি আধখানা দেহ জলে ভাসছে আর উর্দ্ধাঙ্গ রয়েছে মজে যাওয়া ক্ষয়-ধরা ভাঙা ইটের স্তুপের ওপরে। পরনে কালা ফুলপাড় মিহিশাড়ি হাতে-গলায় কানে রুপোর গহনা, নাকে পাথরের নাকছাবি। বয়সে যুবতী, কোন গ্রাম্য গৃহস্থের কুলবধূ নিশ্চয়ই। কেননা মাথায় একরাশ ভ্রমণ-কালো চুলের থাঝখানে চাওড়া লাল সিন্দুর ডগডগ করছে।

কিন্তু কে এই কৌতুকময়ী কুলবধূ। উনি কি মৃত? কিন্তু মরা মানুষ কি নড়ে? স্পষ্ট দেখলাম সিড়ির একটা কোণ ধরে বউটি উঠবার চেষ্টা করছে আবার শ্যাওলায় হড়কে নেবে যাচ্ছে। আমি অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য দেখলাম।

* * * * *

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন স্যার?

চমকে ফিরে দাঁড়িয়ে দেখি মেকাপ-ম্যান বঙ্কু এসে দাঁড়িয়েছে আমার পিছনে। বাতাসে একটা পরিচিত গন্ধ পেয়ে বুঝলাম, বঙ্কু সুরাপান করেছে।

সে বললে, খাসা জায়গাটি। একদিন বাগান-পাটি করলে হয়

এখানে। কি দেখছেন স্যার ? মরা মেয়েছেলে দেখে আর লাভ কি ?

বললাম, মরা মানুষ কি নড়ে বন্ধু ? মরা মানুষ কি ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে ? ওই দেখ --

সিড়ির শেষ ধাপ থেকে আমাদের দিকে নিস্পলক চোখে তাকিয়ে প্রেত্তিনী বৌ তখন বুকে ভর দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে।

ভেবেছিলাম এবারে বন্ধুর সুধার নেশা কেটে যাবে এবং রামনাম স্মরণ করে সোজা চম্পট দেবে। কিন্তু না, তার বদলে মাতাল বন্ধু একটা বিচিত্র কাণ্ড করে বসল। মিনিটখানেক জলে ভাসা লাসটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে হঠাৎ একখানা আধলা ইট সজোরে ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। ইটখানা গিয়ে লাগল মৃতদেহের পেটের কাছটায়। আর সঙ্গে সঙ্গে 'কেঁউ কেঁউ রবে সকরুণ আর্তনাদ তুলে মৃতদেহের পেটের তলা থেকে বেরিয়ে এল একটি দেশী নেড়ি কুকুর তারপর ল্যাজ গুটিয়ে সভয়ে প্রস্থান।

অট্টহাস্যে বন্ধু তখন খ্যাড়া মাঠ কাঁপিয়ে তুলেছে।

এতক্ষণে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম মৃতদেহের পেটের কাছে একটা বিরাট গহ্বর। খিদের জ্বালায় নেড়ি কুকুরটি তারই মধ্যে। ঢুকেছিল। আসলে নড়ছিল কুকুরটাই, মরা চাষী-বউ নয়।

ঘাটের ওপরে একটা অস্ফুট শব্দ শুনে তাকিয়ে দেখি নায়কের জ্ঞান ফিরেছে।

— — —

—শুভ আশীর্বাদ

আমারই বাড়ির নীচের দুইখানি ঘর ভাড়া দেওয়া হইবে বলিয়া দরজায় এক নোটিশ টাঙাইয়া দিয়াছিলাম। কলিকাতা শহর। ভাড়াটের অভাব হইল না। তিন দিন পার হইতে না হইতেই লোক জুটিয়া গেল। যিনি আসিলেন, সংসার বলিতে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং প্রথম পক্ষের একটি মেয়ে। মাত্র এই তিনটি প্রাণী। সুতরাং দু'খানি ঘরই তাঁহাদের পক্ষে যথেষ্ট। বাস করিবার অসুবিধা বিশেষ কিছুই হইবে না।

ভদ্রলোকের নাম জানিলাম—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। জাতিতে ব্রাহ্মণ। ভাল কথা। কিন্তু কি করেন, কেমন করিয়া দিন চলে, সকথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জাও করে, অথচ না জানিলেও নয়। ইহার আগে তিন তিনটা লোক আমাকে ঠকাইয়া গিয়াছে। তার মাসের ভাড়া বাকি রাখিয়া এক ভদ্রলোক ত' রাতারাতি চম্পট দিলেন। সকালে উঠিয়া দেখিলাম, ঘর-দোর খাঁ খাঁ করিতেছে, কোথাও একটি কুটা পর্যন্ত পড়িয়া নাই। যাইবার সময় দয়া করিয়া ইলেকট্রিক আলোর বাল্বগুলি খুলিয়া লইয়া গিয়াছেন, রান্নাঘরে গিয়ে দেখি উনান দুইটি ভাঙ্গিয়া লোহার শিক কয়টি ছাড়ানো হইয়াছে, কলতলায় জল ধরিবার জন্য টিনের একটা চোঙ তৈরী করাইয়াছিলাম, দেখিলাম সেটিও তাঁহাদের সঙ্গে গিয়াছে। তিন চারিটি ছেলেমেয়ে লইয়া ভদ্রলোক যে গত রাত্রে কেমন করিয়া নিঃশব্দে সরিয়া পড়িয়াছেন কিছুই জানিতে পারি নাই। দ্বিতীয় ভদ্রলোক অনেক সন্ধান করিয়াও কিছুতেই একটা চাকরি জুটাইতে পারিলেন না এবং চাকরি না পাইলে ভাড়াই বা দিবেন কেমন

করিয়া। তাড়াইতেও কষ্ট হইয়াছে কিন্তু তাঁহাকে আমি নিজেই তাড়াইয়াছি। তাহার পর তৃতীয় মহাপ্রভু। সেরকম মানুষ আমি খুবই কম দেখিয়াছি! ভাড়া চাইলেই বলিতেন—টাকা নাই। তিন চার মাস ভাড়া তাঁহার বাকি পড়িল। বলিলাম, এবার যদি দয়া করে টাকাটা দেন ত' ভাল হয়। বলিলেন, সবই জানি, কিন্তু উপায় নেই। ভয়ানক রাগ হইল। বলিলাম, তার মানে?

বলিলেন, কড়া কথা বলবেন না মশাই, আমার রাগ ভারি খারাপ। হয়ত কোন্‌দিন মেরে বসব।

সর্ব্বনাশ।

বলিলাম, কি করব তাহ'লে?

অপেক্ষা করুন।

আর যে অপেক্ষা করতে পারছিনি মশায়।

আদালত আছে। নালিশ করুন।

বলিলাম, সেটা কি ভাল? সে আমি করতে চাই না।

বলিলেন, ঠিক বলেছেন। ও-সব হাঙ্গামা করে কিছু লাভ নেই। অনেক শালাই করেছে, কিন্তু সব শালাকেই আমি ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছি।

দেখিলাম, তাঁহার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি করা বৃথা। করিবার প্রবৃত্তিও নাই। বলিলাম, তা হলে দয়া করে আপনি যদি বাড়িখানি আমার—

বাস, আর বলতে হবে না। এই যে ভাল করে বললেন মশাই, এরই দাম লাখ টাকা। আসছে মাসেই আপনার বাড়ি ছেড়ে দেবো।

পরের মাসে বাড়িখানি সত্যিই তিনি ছাড়িয়া দিলেন। ভাবিয়াছিলাম, যাইবার সময় ভাড়ার দরুণ কিছু টাকা অন্ততঃ তিনি দিয়া

করবেন। কিন্তু কিছুই দিলেন না। হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া শুষ্ক একটি নমস্কার জানাইয়া তিনি গাড়িতে গিয়ে উঠিলেন।

এই ঘটনার প্রায় সাত মাস পরে একদিন সকালে আমি বাজারে যাইবার জন্য বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছি, দরজার কাছেই হঠাৎ সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা! আমায় দেখিয়াই তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, দাঁড়ান মশাই, হন্ হন্ করে পালাবেন না। আপনার সঙ্গে আমার প্রয়োজন আছে।

বলিয়াই তিনি পকেটে হাত দিয়া দশ টাকায় ছ'খানি নোট বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। নগদ ষাট টাকা পনেরো টাকা করিয়া চার মাসের ভাড়া।

টাকার আশা আমি ছাড়িয়াই দিয়াছিলাম, কিন্তু শুষ্ক একটুখানি ধন্যবাদ দিবার অবসর তিনি আমায় দিলেন না। যেমন অতর্কিতে আসিয়াছিলেন আবার তেমনি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

* * *

এবার আমি ঠকিতে চাই না। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কি করেন সেইজন্যই সেদিন জানিতে চাহিলাম।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের চেয়ে আমি অনেক ছোট। বলিলেন, যাহোক একটা কিছু করতে হয় বই-কি বাবাজি, নইলে চলে কেমন করে?

এই বলিয়া কিছুক্ষণ থামিয়া তিনি আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, লোক আমার সংসারে মাত্র দু'জন কিন্তু তাদের ষ্টাইল তুমি এখনও ছাখনি। দেখলে বলবে হাঁা, চক্কোত্তি-মশাই-এর খরচ অনেক।

যাই হোক সে সব শুনিয়া আমার কোনও লাভ নেই। কি করেন, কি তাঁহার উপজীবিকা কিছুতেই সে কথা তিনি আমায় বলিলেন না। বলিলেন না যখন, তখন আর অনর্থক পীড়াপীড়ি

করা ভদ্রতাবিরুদ্ধ মনে করিলাম। প্রথম মাসের ভাড়া তিনি আমায় অগ্রিম দিয়াছেন। টাকা কয়টি আমার হাতে দিয়া বলিলেন, নিন্‌ না না, তোমায় আর আপনি বলব না। তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। নাও টাকা ক'টা বাজিয়ে নাও। অচল টাকা থাকলে আবার শেষে বলবে হয়ত—চকোত্তি আমায় ঠকালে আমি সেরকমের লোক নই বাবাজী!

টাক কয়টি ঠুং ঠুং করিয়া সেইখানেই ঠুকিয়া ঠুকিয়া বাজাইতেছিলাম। চক্রবর্ত্তী সতৃষ্ণ নয়নে সেইদিক পানে তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন, মাসের শেষে এই পনেরোটা করে টাকা বাবাজি ন দেবায় ন ধর্ম্মায়। কাকে যে দিচ্ছি তার ঠিক নেই, কেন যে দিচ্ছি তাব ঠিক নেই। বাড়ীতে রয়েছি তার দাম দিতে হবে একটি দিন কোনরকমে কাটিয়েছি কি বাস্‌ আট আনা পয়সা গেল দিতে বড় কষ্ট হয় বাবাজি, কিন্তু সহরে বাস করছি কি আর করব, দিতেই হবে।

বুঝিলাম—লোকটার কাণ্ডজ্ঞান আছে। ভাড়া আমার মারা যাবে না।

চক্রবর্ত্তী আবার বললেন, কিন্তু বাবাজি, বেশীদিন ত' আমি থাকব না এখানে। আর কাউকে বলিনি, তোমাকেই বলে শোনো। বাড়ী একখানা আমার তৈরী হচ্চে সেখানা শেষ হ'তে—তা প্রায় মাস পাঁচ ছয় দেরী আছে সে বাড়ি আমার যতদিন না শেষ হয় তত দিন। বাস্‌ তারপরেই আমাকে আর দেখতে পাবে না।

হাসিয়া বলিলাম, কেন দেখতে পাব না? আপনার মত মানুষের দেখা পাওয়া সৌভাগ্যের বিষয়। এখানে না থাকেন, আপনার বাড়িতেই যাব মাঝে মাঝে।

চক্রবর্ত্তী হাসিতে লাগিলেন। হেঁ হেঁ যাবে বই কি বাবাজী নিশ্চয়ই যাবে। গৃহ-প্রবেশের দিন নিমন্ত্রণ করেই নিয়ে যাব।

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া তিনি আবার বলিতে লাগিলেন। এই যে পনেরো টাকার ভাড়ার আমি রয়েছি এখানে, তার কারণ—অনর্থক কটা মাসের জন্যে বেশী টাকা আর দিই কেন? নইলে এবাড়ীতে থাকবার কথা আমার নয় বাবাজি? নিতান্ত সন্তর্পণে আমায় এখানে লুকিয়ে থাকতে হয়। এ যেন আমার অজ্ঞাতবাস, বুঝলে?

বলিয়াই তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

ভাবিলাম, এত বড এই পয়সাওয়ালা লোকটাকে কি করেন জিজ্ঞাসা করা সেদিন আমার অন্যায় হয়েছে। বলিলাম. সেদিন আপনাকে আমি না জেনে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কি করেন। তার জন্যে আমায় ক্ষমা করবেন।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, সেজন্যে তোমার ত' দোষ নেই বাবাজি, দোষ আমার আমি কাউকে জানতে দিতে চাই না যে. এই কলকাতা সহরে চারখানা বড় বড় বাড়ি আমার ভাড়ায় খাটছে, আর একখানা তৈরী করছি নিজে বাস করবার জন্যে। আমার বাড়ির কথা ছেড়ে দাও, আমার চালচলন দেখলে কিছুতেই তুমি সেকথা টের পাবে না, এ আমি জোর করে বলতে পারি। তা তুমি তোমার কর্ত্তব্যই করেছ। এতে আর দোষের কি আছে? কলকাতা শহরে কত জোচ্চোর, কত বদমাস কি রকম ভাবে ঘুরে বেড়ায় তা ত' তুমি জান না বাবাজি, তুমি ছেলে মানুষ। আমার চার-চারটে ভাড়াটের সঙ্গে কারবার করতে হয়,—আমি জানি।

আমিও আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা তাঁহাকে বলিলাম। শুনিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, তোমার ত এই সামান্য টাকার ওপর দিয়েই গেছে বাবাজি, আমার গেছে - তা প্রায় হাজার ছয়েক। তার জন্যে দুঃখ করে লাভ নেই, বুঝলে? এমন কত হাজার টাকা এই নিজের হাতে রোজগার করলাম, আবার কত

হাজার গেল।—ওই যে আমার প্রতিমার মত গৌরী ওর বিয়ে দিলাম পনেরো হাজার টাকা খরচ ক'রে কি হলো? দু'বছর পেরোতে না পেরোতেই বিধবা হয়ে ফিরে এলো।

বিধবা!

শুনিয়া সত্যই বড় কষ্ট হইল। কলে সে কাল জল ধরিতেছিল। তাহাকে আমি বেশ ভাল করিয়াই দেখিয়াছি। অপরূপ সুন্দরী বলিতে যাহা বুঝায় সে বুঝি তাহার চেয়েও বেশী। বয়স সত্তেরো আঠারোর বেশী নয়। আমি ত' ভাবিয়াছিলাম—এখনও তাহার বিবাহই হয় নাই।

বলিলাম—গৌরীকে আমি দেখেছি। আহা বিধবা হয়ে গেছে। আমি ত' ভেবেছিলাম—এখনও বিয়েই হয়নি। তা' যেরকম ওর বয়েস, আপনি ত' আবার ওর বিয়ে দিতে পারেন।

চক্রবর্ত্তী কটমট করিয়া আমার মুখের পানে তাকাইলেন। দেখিয়া মনে হইল, তিনি রাগিয়াছেন। বলিলেন, কি বললে? বিধবা-বিবাহ? দু' একজন আমায় বলেছিল বটে, কিন্তু ছি ছি ছি! আমরা হিন্দু, ব্রাহ্মণ, ওসব কথা আমার কাছে উচ্চারণ কোরো না বাবাজী। আমি কি করব বল, আমি আমার কর্ত্তব্য করেছিলাম। ওর অদৃষ্টে স্বামীভাগ্য নেই ত' আর কে কি করবে বল; এখন ওর কর্ম্মফল ওকে ভোগ করতে দাও।

আমারও একটুখানি রাগ হইল। বলিলাম, তাহলে আপনিই বা দ্বিতীয়বার বিবাহ করলেন কেন?

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, মেয়ের বিবাহের আগেই আমি করেছি। সন্তানাদি হয়নি বলে। ভেবেছিলাম—মেয়ে ত' পরের বাড়ি চলে যাবে আর আমার এত বিষয়-সম্পত্তি—যাবে কে? তাও দশ জনের অনুরোধে করেছি বাবাজি, নিজের ইচ্ছা বিশেষ ছিল না।

* * *

প্রায় দেখি, দুপুরে আহারাদির পর চক্রবর্ত্তী বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যান।

কোথায় যান সেকথা জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন হয় না। এক হাতে কয়েকটি টাকা, আর একহাতে পোস্টাপিসের পাশ বই। —ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে।

টাকা জমা তিনি প্রায় প্রত্যহ দেন, এবং যাইবার সময় প্রত্যহই আমার সঙ্গে দেখাও হইয়া যায়। বলেন, কই তোমায় ত' ডাকঘরের দিকে যেতে দেখি না বাবাজি, তোমার কি সঞ্চয়ের অভ্যেস নেই নাকি?

হাসিয়া বলিলাম, টাকা কোথায় যে সঞ্চয় করব!

ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন—না, না, না, বড় ভুল কর বাবাজি। টাকাতেই মান, টাকাতেই সম্মান, অসময়ে এ জিনিষের দাম বড় বেশী। খুচরো খালি টাকা আমি রোজই দিয়ে আসি পোস্টাপিসে, আর মোটা টাকা চলে যায়—ব্যাঙ্কে। তোমারও কিছু টাকা পোস্টাপিসে রাখা উচিত।

রাখা উচিত তাহা জানি, কিন্তু কেমন করিয়া রাখি?

শেষে তিনিই আমায় উপায় বলিয়া দিলেন। বলিলেন, এই যে তুমি নীচের তলাটি ভাড়া দিয়েছ এই ভাড়ার টাকা দিয়ে কি তোমার সংসার চলে?

বললাম, না।

চক্রবর্ত্তী বলিলেন, তাহলে এক কাজ কর। মনে কর যে, এ বাড়ি তুমি ভাড়া দাওনি। আমার কাছে তোমার একশ টাকা পাওনা হোক্, তারপর একদিন একসঙ্গে একশ টাকা তুমি আমার কাছ থেকে নাও। নিয়ে পোস্টাপিসের একখানা খাতা কর। যখন যা পাবে ওইতে রেখে দিও।

বুদ্ধি মন্দ নয়। তাহাতেই রাজি হইলাম। ভাড়ার টাকা চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কাছেই জমিতে লাগিল।

* * *

নীচের তলাটা ভাড়া দিতাম বলিয়া আমার দোতলার সঙ্গে তাহাদের কোনও সংস্রবই রাখি নাই। দরজা আলাদা করিয়া দিয়াছিলাম। কল-পায়খানা আলাদা। তাহাদের ইলেকট্রিকের মিটারেরও পৃথক বন্দোবস্ত।

সদর দরজায় বাহির হইতে তালাচাবি বন্ধ করিয়া দেন।

তালা বন্ধ করিয়া বাহিরে যাইবার কারণটা কি হইতে পারে মনে-মনে ভাবিতাম। একদিন ভাবিলাম, জিজ্ঞাসা করিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা তাঁহাকে করিতে হইল না। সেদিন আমি স্বচক্ষে ব্যাপারটা দেখিতে পাইলাম বলিয়াই বোধকরি নিজেই সেকথা আমায় তিনি জানাইলেন। একটুখানি আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিলেন, বাড়ীতে এক আমি ছাড়া পুরুষ-ব্যাটাছেলে কেউ নেই, বুঝতে পারছ বাবাজি, ওদের দু'জনের বয়স খারাপ। তার ওপর —সেই শাস্ত্রে আছে না, বিশ্বাস নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ। ওটা খুব সত্যি কথা বাবাজি, ও-জাতটিকে বিশ্বাস কোরো না।

এই বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তিনি আবার বলিলেন, সতরে বিনাশ নেই। আগে থেকে সতর্ক হ'লে আর ভবিষ্যতে কষ্ট পেতে হয় না।

চক্রবর্ত্তী অন্যায় কিছু বলেন নাই। তাঁহার কন্যাকে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু স্ত্রীকে কোনোদিনই দেখি নাই। সেদিন দেখিলাম রাস্তার, পাশে জানালার গরাদ ধরিয়া তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। দ্বিপ্রহরে প্রখর রৌদ্র জানালার পথে দিয়া ঢুকিয়াছে। জানালার রঙিন পর্দাটি সরাইয়া দিয়া এক পিঠ কালো চুল এলাইয়া তিনি বোধহয় চুল শুকাইতেছিলেন। দেখিলাম, বয়স তাঁহারও বেশী নয়। গৌরীর

চেয়ে হয়ত দু'এক বছরের বড় হইতে পারে কিন্তু রূপ ও যৌবন যেন তাঁহার চারিদিক আলো করিয়া আছে।

*   *   *

সেদিন রাত্রে শুনিলাম, চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া কাহাকে যেন তিরস্কার করিতেছেন।

ব'লতেছেন: এত এত ভাত রোজ তোমরা কেন ফেলে দাও শুনি? খেতে যদি না পারো, কম ক'রে চা'ল নিও। পেট যদি না ভরে, গরীবের সংসায় ত' নয়– এক পয়সার মুড়ি আনিয়ে রেখো।

শেষের কথাটা শুনিয়া আমি হাসিয়া ফেলিলাম।

সে-হাসির শব্দ বোধকরি চক্রবর্ত্তী শুনিতে পাইলেন। বলিলে, হাসছো বাবাজি? আমার কথা শুনে হাসছো বুঝি? কিন্তু হেসো বাবাজি, আমি ঠিকই বলেছি। লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেললে অন্নাভাবে লক্ষ্মীছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়।

এই বলিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর আবার যেন কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, ভাবছো বুঝি লোকটা কি কৃপণ! কিন্তু কৃপণ না হ'লে এই এত এত বিষয়-সম্পত্তি করতে পারতাম না বাবাজি!

কিন্তু কি কুক্ষণেই যে তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিলাম আর সেই হাসি শুনিয়া চক্রবর্ত্তী চীৎকার করিয়া কৃপণতার কথাটা আমাকে শোনাইয়াছিলেন কে জানে, সেই কথা শুনিয়া অবধি আমার মা আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছেন।

—শুনলি? ওরে ও ওড়নচণ্ডী, শোন্। কৃপণ না হ'লে পয়সা হয় কখনও, না কেউ সুখে থাকে? শুনলি ত?

সেইদিন হইতে দিবারাত্রি শুধু সেই চক্রবর্ত্তীর দৃষ্টান্ত। মার মুখে তাহা যেন লাগিয়াই রহিল।

নূতন একখানা জামা কিনিয়া আনিয়াছি, মাকে দেখাইলাম কেমন জামা ছাখো ত' মা ?

কত দাম ?

আড়াই টাকার জায়গায় কমাইয়া বলিলাম, দেড় টাকা।

ঠোঁটে এক প্রকার শব্দ করিয়া মা বলিলেন, ঐ কর্ আর-কি! পঞ্চাশ গণ্ডা জামাই কেনো। চক্কোত্তি ক'টা জামা পড়ে? দেখতে পাস না? পয়সা কি আর অমনি হয় রে!

মাকে একদিন বলিলাম, তুমি ওঁর স্ত্রীর কাছে একদিন যেয়ো মা। গিয়ে জিজ্ঞাসা কোরো, চক্কোর্ত্তির কৃপণতার জন্যে উনি কেমন সুখে আছেন! আমার মনে হয়—চক্কোর্ত্তি মশাই ভাল করে ওদের খেতে পরতেও দেন না।

কিন্তু সে পথ বন্ধ।

মা বলিলেন, যাবার জো নেই। নইলে যেতাম!

শেষে একদিন মা'র কাছেই শুনিলাম—চক্রবর্ত্তী মহাশয় কাহাকেও তাঁহার বাড়ি ঢুকিতে দেন না।

মা বলিলেন, ভালই করেন বাছা। উনি বলেন, তাতেই নানা রকমের কথা ওঠে। তার চেয়ে আমি আপনার বাড়ির ভেতর কি করি না করি লোকে তা জানবে কেন? আর তোর ছাখ্ দেখি! যত রাজ্যের বন্ধু-বান্ধব দিবারাত্তির এসে এসে একেবারে হুড়মুড় করে অন্দর মহলে ঢোকে। ও সব ভাল নয় রে, ভাল নয়। বৌ এলে বুঝবি মজা!

* * *

সে যাই হোক, চক্রবর্ত্তী আসিবার ছ' মাস তখনও পার হয় নাই, একদিন সন্ধ্যায় শুনিলাম চক্রবর্ত্তীর জ্বর হইয়াছে। সামান্য জ্বর— দু-একদিনেই সারিয়া যাইবার কথা। কিন্তু দুদিন গেল, তিনদিন

গেল, বাড়ি হইতে চক্রবর্তীকে বাহির হইতেও দেখিলাম না, কোন সাড়া-শব্দই পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার হুকুম নাই, তাহা না হলে ভিতরে গিয়া খবর লইয়া আসিতে পারিতাম।

অসুখ বেশি বাড়িয়াছে কিনা তাই-বা কে জানে।

কিন্তু বাড়াবাড়ি হইলে ডাক্তার আসিতেন নিশ্চয়ই!

এমনি করিয়াই দিন কাটিতেছে, হঠাৎ সেদিন রাত্রে কান্নার শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। মনে হইল, চক্রবর্ত্তীর বাড়ীর মধ্যে মেয়েদের কান্না!

বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না। সরাসরি ভিতরে গিয়া ঢুকিলাম, চকোত্তি মশাই!

আমার পায়ের কাছে আলুলায়িতকেশা গৌরী আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল।—বাবা নেই!

দেখিলাম, ঘরের মেঝের একপাশে মাটির উপর চক্রবর্ত্তীর বিশাল দেহ সটান লম্বা হইয়া পড়িয়া আছে। মৃতদেহের উপর সাদা চাদর ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে। শিয়রের কাছে তাঁহার স্ত্রী বসিয়া আর তাহারই পাশে মিট্ মিট্ করিয়া একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে।

ঘরের এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, আসবাবপত্র কিছুই দেখিতে পাইলাম না।

এমন সময় আর বৃথা চিন্তা করিয়া লাভ নাই। মৃতদেহের সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বন্ধু-বান্ধব কয়েকজন ডাকিয়া আনিলাম। মৃতদেহ বাড়ি হইতে বাহিরে আনা হইল। কিন্তু সংকার করিতে হইলে টাকার প্রয়োজন।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গৌরী কাঁদিতেছিল। কাছে

গিয়া বলিলাম তোমার মাকে একবার জিজ্ঞাসা কর ত'—ওঁর কাছে খুচরো টাকা আছে?

গৌরী তাহার মার কাছে যাইতে কেমন যেন ইতস্ততঃ করিতেছিল। তবু আমি দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া একবার একটুখানি আগাইয়া গেল, কিন্তু তাহার কাছ পর্যন্ত না গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, ওঁর কাছে নেই আমি জানি। আপনি এখন নিজের কাছ থেকে নিয়ে যান তারপর—

আর বেশি কিছু বলিতে হইল না। আমি নিজেই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গিয়া মার কাছ হইতে টাকা লইয়া মাকে তাহাদের দেখাশুনা করিবার কথা বলিয়া আসিলাম।

মৃতদেহের সৎকার করিয়া বাড়ি যখন ফিরিলাম তখন প্রভাত হইয়া গেছে।

শ্মশান বন্ধুদের বিদায় করিয়া বাড়ি ঢুকিয়া দেখি—গৌরী আমাদের দোতালায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। আমাদের ফিরিবার অপেক্ষায় সে জানালার কাছটিতে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার মা কোথায় গৌরী?

হেঁটমুখে ধীর নম্রকণ্ঠে গৌরী বলিল, আপনি বসুন!

মা বৃদ্ধ হইয়াছেন। রাত্রি জাগিয়া তিনি আবার ঘুমাইয়া পড়িলেন।

গৌরীকে আমি আমার নিজের ঘরে ডাকিয়া বসাইলাম!

কাঁদিতে কাঁদিতে সে যাহা বলিল, শুনিয়া আমার পায়ের তলা হইতে পৃথিবীটা যেন সরিয়া যাইতে লাগিল, চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম।

গৌরী বলিল:

যে-মেয়েটিকে আমি তাহার বিমাতা বলিয়া জানি, সে তাহার মা নয়—বিমাতাও নয়। চক্রবর্তী তাহার এক বন্ধুপত্নীকে হরণ করিয়া

গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া এমনি করিয়া লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়াইতেছে। কলিকাতা সহরে চার-পাঁচ খানা বাড়িও তাঁহার নাই, নূতন কোনও বাড়িও তৈরী হইতেছে না, এই মেয়েটিরই কিছু টাকা এবং গয়না ছিল, তাহাই ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া অতি কষ্টে তাহাদের দিন চলিতেছিল। আজ চক্রবর্ত্তীর অকস্মাৎ মৃত্যু যখন তাহাদের সমস্ত গোপন রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করিয়া দিয়াছে, তখন আর গোপন করিয়া কিছু লাভ নাই।

কি বলিয়া নিজের পরিচয় দিবে এই ভয়ে মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া যাইবার পরেই সেই মেয়েটি কোথায় যে পলায়ন করিয়াছে, গৌরী নিজেও তাহা জানে না।

বলিলাম—টাকাকড়ি কিছুই কি তিনি রেখে যাননি? আমি যে প্রায়ই দেখতাম পোষ্টাপিসের একটা খাতা নিয়ে—

গৌরী তাহার কাপড়ের তলা হইতে ডাকঘরের খাতাটি আমার কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বলিল, সে শুধু আপনাকে ফাঁকি দেবার জন্যে।

খাতাটি খুলিয়া দেখিলাম, কোথায় কোন্ নদীয়া জিলার কোন একটা ছোট ডাকঘরের একটি খাতা। এককালে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাহাতে পঁচিশটি টাকা জমা দিয়াছিলেন, তাহার পর দুটি একটি করিয়া সবই আবার তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। এখন জমার ঘরে শূন্য। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম—সেই খাতাটিই বটে।

—এখন তোমার কি হবে? একে এই বয়েস, তার উপর বিধবা।

কথাটা কোন প্রকারেই জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেছিলাম না; তবু শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করিলাম।

গৌরীর সেই আয়ত দুটি চোখের কোণ বাহিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইয়া আসিল। ঠোঁট দুইটি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে

লাগিল। অতি কষ্টে বলিল আমি বিধবা নই। বাবা আমার বিয়ে এখনও দিতে পারেননি বলেই আমায় তিনি বিধবা বলতেন।

সর্ব্বনাশ।

তুমি কুমারী? বিয়ে তোমার এখও হয়নি?

শুধু একবার মাথাটি নাড়িয়া গৌরী বলিল, না।

* * *

গল্প আমাদের এইখানেই শেষ হইয়া গেছে। কিন্তু এই বহ্নিবর্ণা রূপসী গৌরীর অসহায়তা শুধু আমার নয়, আপনার নয়,—বোধকরি এ বিশ্বের বিধাতার বক্ষে গিয়াও বাজিয়াছিল। তাঁহারই অব্যর্থ বিধান ব্যর্থ করিতে না পারিয়া—

গৌরীকে আমিই শেষ বিবাহ করিয়াছি।

আপনারা আমাদের আশীর্বাদ করুন।

———

—জ্যেঠামশায়

অতি অদ্ভুত মানুষ এই মণিলাল। মাথায় একমাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, লম্বা গোঁফ আর লম্বা দাড়ি, পরণে ধুতি। হঠাৎ দেখলে সাধু সন্ন্যাসী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু আসলে সে সাধু মোটেই নয়। বিবাহ করিয়াছিল, বৌ মরিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর বিবাহ করে নাই। কেহ বলে, বৌএর জন্যই লোকটা ওই রকম। কেহ বলে লোকটা বুজরুক। কেহ বলে, উহার সবই ভণ্ডামি।

তা ভণ্ড হয়ত সে হইতেও পারে। কারণ টাকাকড়ির উপর তাহার অসাধারণ মমতা। গ্রামের লোককে হোমিওপ্যাথী ঔষধ দেয়। লোকে বলে নাকি খুব ভাল ডাক্তার, কিন্তু পয়সা ছাড়া তাহার সঙ্গে কথা নাই একা মানুষ, তবু এত পয়সার কাঙ্গাল কেন?

অথচ সে পয়সা কারও কাজে লাগে না। এমন কি তাহারই সহোদর ছোট ভাই জীবন একবার বলিল, আমায় কিছু টাকা দেবে দাদা? আনলার মাকে তাহ'লে একবার কল্‌কাতায় নিয়ে গিয়ে চিকিৎসাটা করাই।

মণিলাল বলিল, যাও না কল্‌কাতায়, সেখানে ত' তোমার শালা আছে।

শালা আছে, কিন্তু টাকা ত' নেই।

মণিলাল বলিল, টাকা আমারই বা কোথায়?

এই বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সে জবাব দিল। স্ত্রীকে আর জীবনের কলিকাতা লইয়া যাওয়া হইল না। বিনা চিকিৎসায় দেশেই একদিন সে মরিয়া গেল। রাখিয়া গেল একটিমাত্র মেয়ে। অনিলা তাহার নাম। অনিলাকে জীবন মানুষ করিতেছিল, কিন্তু কেমন করিয়া না জানি জীবনেরও একদিন ডাক পড়িল। মণিলালের

হোমিওপ্যাথী কোনো প্রকারেই অসুখকে রাখিতে পারিল না।—মণিলালের বোধ করি ভালই হইল।

একটি মাত্র ভাই, পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তির ভাগ লইয়া কিছুদিনের জন্যে অন্ততঃ কেহ আর টানাটানি করিবে না। অনিলা ছেলে নয় মেয়ে; তাহার বিবাহ হইবে, ছেলে হইবে—সে এখন অনেক দিনের কথা। ততদিন মেয়েটা বাঁচিবে কি মরিবে তাহার স্থিরতা নাই। মেয়েটা বাঁচুক আগে! লোকে বলিতে লাগিল, মণিলাল যে-রকম লোক, কোন্ দিন হয়ত তুক্‌তাক্ করিয়া মেয়েটাকেও সে মারিয়া ফেলিবে। কিন্তু আশ্চর্য্য, পাঁচ ছ' বছরের ফুটফুটে ছোট্ট ওই মেয়েটি জ্যেঠামশায়কে তাহার কি মন্ত্র দিয়া যে বশ করিল কে জানে, মণিলাল নিজেই তাহার পরিচর্য্যা করিতে আরম্ভ করিল। মণিলালের অভ্যাস—নিজেই রান্না করিয়া খাওয়া, কিন্তু অনিলার জন্যই বোধ করি একজন রাঁধুনী তাহাকে রাখিতে হইল। একজন রাঁধুনী রাখিল, একজন চাকরও রাখিল। লোকজন বলিতে লাগিল ইহার হইল কি?

কিছু যে না হইয়াছে তাহা নয়। গরদের ধুতি সহজে ময়লা, হয় না বলিয়া যে গরদ পরে, সহজে একটি পয়সাও যে লোক খরচ করতে চায় না, সেই মণিলালকেই একদিন দেখা গেল, শহরে গিয়া অনিলার জন্য ভাল ভাল জামাকাপড় কিনিতেছে, হাতগুলো খালি থাকলে ভাল দেখায় না তাই সে অনিলার জন্য কয়েকগাছা সোনার চুড়ি পর্যন্ত গড়াইতে দিয়াছে। কিন্তু এত করিয়াও অনিলা যখন রাত্রে এক-একদিন মা মা বলিয়া ঘুমের ঘোরে চিৎকার করিয়া উঠে, উদাস দৃষ্টিতে এক-এক সময় চুপ করিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া থাকে, তখন মণিলালের কেমন যেন মনে হয়। মনে হয় মেয়েটা বুঝি-বা তাহার মাকে খুঁজিতেছে। বাড়ীতে মেয়েমানুষ নাই, কেইবা তাহার মনের দুঃখ বুঝিবে।

মণিলালেরও কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। আহা, মা-বাপ-হারা ওই একরত্তি মেয়ে, এমন করিয়া মনের দুঃখ চাপিয়া চাপিয়া যদি গুম্‌রাইতে থাকে, হয়ত বা কোনদিন অসুখে পড়িয়া যাইবে। তাহার চেয়ে কাজ নাই—

মণিলাল একদিন অনিলাকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা রওনা হইল। কলিকাতায় অনিলার মামার বাড়ী। মামা আছে, মামীমা আছে, তবু দুটা মেয়ের মুখ দেখিতে পাইবে।

মামা বলিল, তা বেশ, থাক্ ও এইখানে।

মণিলাল বলিল, আমি এমনি রাখব না। ওর জন্য মাসে আমি পাঁচটি করে টাকা—

কথাটা মামা শেষ করতে দিল না। বলিল, আজ্ঞে না। টাকা আপনাকে পাঠাতে হবে না। তবে ওর বিয়ের সময় যদি পারেন ত' কিছু সাহায্য করবেন। আমার অবস্থা তেমন ভাল নয়।

অনিলা রহিল তাহার মামার বাড়ীতে।

এইবার আমাদের গল্প সুরু। দশ বৎসর পরের ঘটনা। অনিলার বয়স এখন পনেরো। দেখিলে আর চিনিবার জো নাই। যেমন স্বাস্থ্য, তেমনি সুন্দরী। মামা তাহার বিবাহের জন্য মনের মত একটি পাত্রের সন্ধান করিতেছে। কিন্তু মণিলালের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। সেই যে সে অনিলাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছে, তাহার পর আর কোনও সংবাদ নাই। টাকা পাঠানো দূরের কথা, একখানি চিঠিও সে লেখে না। লোকটা বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে তাই বা কে জানে।

অনিলার মামীমা বলিল, এই সময় মিন্সেকে একবার খবর দিলে হয় না? অনিলার বাবার বিষয়-সম্পত্তি কিছু ত' ছিল।

দিচ্ছি খবর। অনিলার মামা তাহাকে একখানি চিঠি লিখিল :

চিঠি লিখিবার দিন চার-পাঁচ পরেই একদিন সকালে হন্তদন্ত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে মণিলাল আসিয়া হাজির। ঠিক সেই চুল, সেই দাড়ি, পরণে গরদ, পায়ে খরম্! এই দশ বৎসরে চুলে তাহার পাক ধরিয়াছে, কিন্তু দাঁত একটিও পড়ে নাই। আসিয়াই বলিল, সময় পাই না ভাই, মরবার ফুরসুৎ নেই। কই, দেখি আমার মাকে কত বড়টি হয়েছে।

অনিলা আসিয়া তাহার জ্যেঠামশায়কে একটি প্রণাম করিয়া হেঁট মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মণিলাল বলিল, এই জন্যেই এখানে রেখে গিয়েছিলাম। আমার কাছে থাকলে কি আর এ চেহারা হ'তো! কাজ করে' করে' খেটে খেটে হয়ত'—

অনিলার চোখের উপর তাহার চোখ পড়িতেই দেখা গেল, বড় বড় চোখ-দুটি জলে ভরা।

মণিলাল বলিল, ও কি রে? চোখে জল কেন?

অনিলার দুই চোখের কোণ বাহিয়া টপ টপ করিয়া দু' ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

মণিলাল নিজের দুই চোখ বন্ধ করিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিল, তাহার পর বলিল, খুব কষ্টে যদি কোনদিন পড়িস্, মা, তৎক্ষণাৎ আমায় একখানি চিঠি লিখে জানাস্। কেমন, জানাবি ত'?

মুখে কোনও কথা না বলিয়া অনিল তাঁহার মাথাটি ঈষৎ কাৎ করিয়া নীরবে তাহার সম্মতি জানাইল!

মণিলাল বলিল, কই, ডাক্ দেখি তোর মামাকে!

মামা আসিলে মণিলাল জিজ্ঞাসা করিল, ওর বিয়ের কি কোথাও কিছু ঠিক করেছ?

মামা বলিল, করেছি। কিন্তু পাঁচশো টাকা চায়!

পাত্রটি ভাল?

মামা বলিল, ভাল।

মণিলালের সঙ্গে ছিল একটা গেরুয়া কাপড়ের ঝুলি। ঝুলির ভিতর হাত ঢুকাইয়া মণিলাল এক তাড়া নোট বাহির করিয়া বলিল, ঠিক পাঁচশ টাকাই এনেছি। নাও ধর।

টাকা পাইয়া মামা অবাক হইয়া গেল।—লোকটা সত্যই অদ্ভুত!

অনিলার বিবাহ হইয়া গেল। বর্দ্ধমান জেলার একটি গ্রামে তাহার শ্বশুর বাড়ী। মধুবুনী ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিয়া মাইল খানেক পথ গরুর গাড়ীতে যাইতে হয়। তা হোক্। জামাইটি ভাল। লেখাপড়া তেমন না শিখিলেও মধুবুনীতে তাহার পৈতৃক একটা কারবার আছে। ধান চালের ছোট একটি আড়ত। আড়তের আয় তেমন বেশী না হইলেও ছোট খাটো সংসারটি তাহাদের তাহাতেই চলে। নিজেদের জমিজমাও কিছু আছে।

অনিলার স্বামীর নাম অনিল। ভাগ্যগুণে মিলিয়াছে ভাল। অনিলের মুখ দেখিলেই মনে হয় অনিলাকে তাহার খুব পছন্দ হইয়াছে। বিবাহের পর, অনিলাকে তাদের গ্রামে লইয়া যাইবার আগে মামাকে ও মামীকে সে বলিয়া আসিয়াছে, সংসারে তাহার মা আর ছোট ছোট দুটি ভাই। কাজেই বৌকে এখন আর সে কলিকাতায় পাঠাইবে না।

গ্রামটির নাম রতনপুর। অনিলা যখন গ্রামে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা নামিয়েছে। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল। সেই অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় অনিলা দেখিল, চারিদিকে বাঁশের গাছ, ঝোপ-জঙ্গল আগাছার মাঝখানে একখানি বাড়ি। ইহাই

রতনপুর। তাহার নারীজন্মের তীর্থক্ষেত্র। কাছাকাছি মাঠে কোথায় যেন শৃগাল ডাকিতেছিল। নববধূকে বরণ করিয়া লইবার জন্য শাশুড়ী বাহির হইয়া আসিলেন, পশ্চাতে আট-দশ বছরের একটি ছেলে আসিল লণ্ঠন হাতে লইয়া ঘরের ভিতরে কোথায় যেন শাঁখ বাজিল, তাহার পর পাড়াপড়শী কয়েকজন, মেয়ের সঙ্গে অনিলা ঘরে গিয়া ঢুকিল। বহুদিনের পুরানো দোতলা একটি দালানবাড়ী। বাহিরের দিকে লাল লাল ইটগুলো যেন দাঁত বাহির করিয়া আছে, কিন্তু ভিতরের ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

রাত্রে আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া অনিল জিজ্ঞাসা করিল, এখানে তোমার মন টিকিবে ত ?

অনিলা ঈষৎ হাসিয়া বলিল, তা কেমন করে বলব ?

অনিল বলিল, নিশ্চয় টিঁকবে। আসলে তুমি ত' পাড়াগাঁয়েরই মেয়ে।

সে কথা সত্য। আসলে সে পল্লীগ্রামেরই মেয়ে। বীরভূম জেলার পল্লীগ্রামে তাহার শৈশবের পাঁচটি বছর কাটিয়াছে তাহার পর পল্লীগ্রাম আর সে জীবনে কোনদিনই দেখে নাই। অনিলা নিতান্ত ছেলেমানুষ নয়। একা শাশুড়ীর কষ্ট হইতেছে দেখিয়া পরের দিন হইতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম্ম সে নিজের হাতেই গ্রহণ করিল, রান্নাবান্না বাসনমাজা কোনও কাজ করিতেই কষ্ট তাহার কিছুই হয় না, কষ্ট হয় শুধু পুকুরে স্নান করিতে। বাড়ীর পাশেই পানায় ভর্ত্তি ছোট একটি পুকুর। ঘন গাছপালার জঙ্গলে পুকুরের পাড় চারিটা দিবারাত্রি যেন অন্ধকার হইয়াই থাকে। ঘাটের ধাপগুলি খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধানো! অতি সাবধানে পা টিপিয়া টিপিয়া সেই সিঁড়ি বাহিয়া ঘাটের জলে গিয়া নামিতে হয়। পুকুরের জলটাও আবার ঠিক বরফের মত ঠাণ্ডা।

পল্লীগ্রামের কত মনোরম বিবরণ সে কত গল্পে উপন্যাস পড়িয়াছে

বাল্যের আবছা স্মৃতি-বিজড়িত তাহার সেই এত সাধের পল্লীগ্রাম! ভাবিয়াছিল তাহার সেই কল্পনার পল্লীগ্রাম, তা'র সেই স্বপ্নের পল্লী-গ্রামের সঙ্গে রতনপুরের বিশেষ কোন প্রভেদ-পার্থক্য থাকবে না, কিন্তু যতই দিন যাইতে থাকে, অনিলা ততই যেন হতাশ হইয়া পড়ে। গ্রীষ্মের পর বর্ষা আসে। দিবারাত্রি ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, পথ ঘাট সব পিছল্ হইয়া ওঠে, চারিদিকে ব্যাংগুলা লাফাইয়া বেড়ায়, এদিকে কেঁচো, ও'দকে কেন্নু দিনের বেলাটা কোন রকমে কাটাইয়া সন্ধ্যায় প্রসাধন সারিয়া ভাল একখানি শাড়ী পরিয়া সে দোতালার একখানি ঘরে গিয়া চুপটি করিয়া বসে। মধুবুনীর আড়ৎ হইতে অনিল যতক্ষণ না বাড়ী ফিরে, সময়টা তাহার যেন আর কাটিতে চায় না। তাহার পর অনিল আসিলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া দু'জনে যখন উপরে উঠিয়া যায়। আবার হখন চারিদিকে অবিরল ধারে বৃষ্টি নামে তখন তাহার মনে হয়, যেন পল্লীগ্রামটাকে যত খারাপ সে ভাবিয়াছিল তত খারাপ নয়। তাহাদের দুজনকে এমনি করিয়া সারা পৃথিবী হইতে আড়াল করিয়া দিয়া বর্ষার জলধারা এমনি অবিশ্রান্ত গতিতে চিরকাল ধরিয়া ঝরিতে থাকুক্।

কিন্তু বর্ষা চিরকাল থাকে না। ধীরে ধীরে কমিতে কমিতে হঠাৎ একদিন মনে হয়, যেন মাথার উপরের আকাশটা পরিষ্কার হইয়া গেছে, কোথাও একবিন্দু কালো মেঘের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। বর্ষাটা যেন খুব তাড়াতাড়ি পার হইয়া গেল।

বর্ষার পর শরৎ আসিল। কাপড় শুকাইতে দিবার জন্য অনিলা সেদিন তাহাদের ভাঙ্গাবাড়ীর ছাদে উঠিয়া দেখিল, গ্রামের বাহিরে শুক্‌নো যে মাঠগুলো এতদিন খাঁ খাঁ করিত, ইহারই মধ্যে কখন যে তাহার শস্যে শস্যে সবুজ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা সে টেরও পায় নাই। চারিদিকে কচি কচি সবুজ ধানের গাছ প্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্রে ঝিক্ মিক্ করিতেছে, চারিদিকে গাছপালাগুলা বাড়িয়া

উঠিয়াছে, যে দিকে তাকাইতেছে সেই দিকেই কেমন যেন একটা ঘনশ্যাম স্নিগ্ধ সজীবতা!

হাতেই পূজা আসিতেছে। অনিলা ভাবিল, পল্লীগ্রামে শারদীয়া পূজার অভিজ্ঞতা জীবনে তাহার এই প্রথম। স্বামীর সঙ্গে কতই না আনন্দে তাহার দিন কাটিবে। ষষ্ঠীর দিন হইতে ত্রয়োদশীর দিন পর্য্যন্ত অনিলকে সে তাহার কাছ ছাড়া করিবে না! এই কয়টা দিন কারবার তাহার বন্ধ থাকিলেই বা ক্ষতি কি! এমন একটা অজানা আনন্দের প্রতীক্ষায় তাহার দিন কাটিতেছে, এমন দিনে তাহার শাশুড়ীঠাকুরাণী অকস্মাৎ জ্বরে পড়িলেন। হন্ হন্ করিয়া কম্প দিয়া তাঁহার জ্বর আসিল। তাহার পরদিন জ্বরে পড়িল তাহার মেজ দেওর সুনীল, তাহার পরের দিন বিমল। বাড়ীতে তিনজন লোক, তিনজনই রোগী। অনিলার মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল।

অনিল হাসিয়া বলিল, ও কিছু না, ও ম্যালেরিয়া! বর্ষার পর এই সময়টায় এমন সকলেরই হয়।

অনিলা একটু অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, সে আবার কি!

হ্যাঁ। ও আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তুমি একটু সাবধানে থেক, এই সময়টায় চান টান বড় একটা ক'র না।

অনিলা বলল, তা হ'লে কি বলতে চাও—এমনি ধারা আমারও হবে?

অনিল হাসিয়া বলিল, হ'তেও পারে। আমারও হবে তোমারও হবে।

কি সর্ব্বনাশ! অনিলা ভাবিল, বর্ষাটা তাহার এত ভাল লাগিল বলিয়াই কি এমনি করিয়া ভগবান তাহাকে শাস্তি দিবেন?

সত্য সত্যই দেখা গেল, গ্রামের প্রায় সব বাড়ীতেই ম্যালেরিয়া

তাহার কায়েমী বন্দোবস্ত পাকা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য. এই ব্যাধিটা যেন ইহাদের নিত্যকার সঙ্গী, অতি-পরিচিত বলিয়া কেহ আর তাহাকে এতটুকু ভয় পর্য্যন্ত করে না।

সুনীল সেদিন অনিলার কাছে এক গ্লাস জল চাহিল। বলিল. বৌদি, আমায় এক গ্লাস জল দেবে ?

কেন দেব না ভাই। বলিয়া জলের গ্লাস আনিয়া অনিলা তাহার শিয়রের কাছে গিয়া বসিল। মাথায় হাত দিয়া বলিল, কেমন আছ ঠাকুরপো ?

সুনীল হাসিয়া বলিল, ভালই। কাল ভাত খাব।

কাল ভাত খাবে কি রকম ? আজও তো তোমার জ্বর ছাড়েনি

সুনীল বলিল, তুমি জান না বৌদি আজ রাত্তিরে দেখবে জ্বর ছেড়ে যাবে, কাল ভাত যদি না খাই তা হ'লে এত দুর্ব্বল হয়ে যাব যে আর উঠতে পারব না। তোমার এক-আধবার হোক্ তা হ'লেই বুঝতে পারবে।

অনিলা বলিল, না ভাই আমার হবে কাজ নেই।

সুনীল হাসিয়া বলিল, হবেই। এখানে থাকলে এর হাত থেকে কারও নিস্তার নেই।

তোমার দাদারও হবে ?

সুনীল বলিল, বা হবে কি রকম ! দাদার ত' পুরানো জ্বর প্রায় রোজই হয়। আড়ালে থাকে বলে বুঝতে পার না। তা বুঝি তোমায় বলেনি।

পুরানো জ্বর হয় আর রোজ ভাত খায় ?

জ্বর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ খায় না। তোমার বুঝি খুব ভয় হয়ে গেল বৌদি ?

অনিলা চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। কথাটার জবাব দিল না।

অনিল সেদিন বাড়ী ফিরিয়া খাওয়া-দাওয়ার পর উপরের ঘরে শুইয়া শুইয়া বিড়ি টানিতেছিল, অনিলা ঘরে ঢুকিয়াই প্রথম তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তাহার পর বুকে হাত দিয়া পিঠে হাত দিয়া বলিল, কই না কিছুই ত' বুঝতে পারছি না।

অনিল হাসিতে লাগিল। বলিল, ভেবেছ বুঝি আমারও জ্বর হয়েছে?

অনিলা বলিল, ঠাকুরপো বলছিল তোমার রোজ পুরানো জ্বর হয়!

অনিল বলিল, এক-একদিন হয় বটে, রোজ হয় না।

অনিলা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সেইখানে বসিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গ্রামে তোমাদের ডাক্তার নেই? জ্বর হ'লে কই কাউকে ত' দেখি না ওষুধ খেতে!

অনিল বলিল, ডাক্তার আছে ওষুধও খায়, কিন্তু ওষুধে কিছু হয় না। এ জ্বর এমনই সেরে যায়।

তা এমনিই হয়ত সারে। কারণ অনিলা তাহার চোখের সুমুখেই দেখিল, দিনদুই পরে শাশুড়ীঠাকরুণ উঠিয়া বসিয়াছেন আবার ঠিক আগে মত কাজকর্ম্মও করিতেছেন, ভাতও খাইতেছেন, স্নানও করিতেছেন। সুনীল ও বিমল দু'জনেই আবার হাসিয়া খেলিয়া ছুটিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। বাড়ী ছাদের উপর পায়রার একটা টোং আছে। টোঙে প্রায়ই পায়রার বাচ্চা হয়। বিমল সেদিন বলিল, আমাকে আজ একটু পায়রার মাংস রেঁধে দিতে হবে। বৌদি, চল পায়রা আনিগে। এই বলিয়া বৌদিকে সঙ্গে লইয়া সে ছাদে গেল পায়রা আনিতে। ছাদের কার্ণিসে পা দিয়া বিমল টোং হাতড়াইয়া পায়রা খুঁজিতেছে আর অনিলা তাকাইয়া আছে মধুবুনী ষ্টেশনের দিকে। ষ্টেশন বেশী দূরে নয়। ধানের মাঠের মাঝখান দিয়া সাপের মত আঁকা-বাঁকা রেলের লাইন পাতা। তাহার উপর দিয়া

ট্রেন চলে। কলিকাতা এখান হইতে কতদূর কে জানে! সেই যে ট্রেনে চড়িয়া বিবাহের পর ওই ষ্টেশনে আসিয়া নামিয়াছে, তাহার পর আর একটি দিনের জন্যও এখান হইতে বাহির হয় নাই। বাহির হইবার প্রয়োজন জীবনে হয়ত আর কোনদিনই হইবে না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনিলা অমনি সব নানান্ কথা ভাবিতেছে, এমন সময় বিমল একটি পায়রার বাচ্চা হাতে লইয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, এখান থেকে তোমার দাদার আড়ত দেখা যায় না।

বিমল বলিল, ওই দেখছ ওই গাছটা, ওই গাছের ওপারে—টিনের চাল দেওয়া আমাদের গদি। এখান থেকে ভাল দেখা যায় না।

অনিলা জিজ্ঞাসা করিল, ওখানে ওই ধোঁয়া কিসের উঠছে বিমল?

বিমল বলিল, বা রে তাও জান না? ওই ত' শ্মশান, গয়লাদের একটা মেয়ে মরেছে আজ। ওকেই পোড়াচ্ছে ওখানে।

এই ত পায়রার বাচ্চা পেয়েছ একটা। চল, বলিয়া অনিলা তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া আসিল। সেইদিন হইতে কি যে তাহার হইল, ছাদে উঠিলেই অনিলার সর্ব্বপ্রথম নজরে পড়ে সেই শ্মশান। ছোট্ট একটি শুকনো নদীর বাঁকের মুখটা দেখা যায়, সাদা বালি চিক্ চিক্ করে, প্রকাণ্ড একটা তেঁতুলের গাছ, আর তাহারই পাশ দিয়া রোজই সে দেখতে পায়—ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক দিয়া দিয়া উর্দ্ধে উঠিতেছে! অনিলার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে থাকে! তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে সে নীচে নামিয়া আসে।

এমনি করিয়া সুদীর্ঘ পাঁচটি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে বিবাহের সময় অনিলার বয়স ছিল পনেরো, এখন তাহার বয়স হইয়াছে কুড়ি। শুধু যে তাহার বয়সেরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা

নয়। এখন আর তাহাকে দেখিলে সে অনিলা বলিয়া চিনিবার জো নাই। ম্যালেরিয়া তাহাকেও ধরিয়াছে। এবং ম্যালেরিয়ার কল্যাণে কোথায় গিয়াছে তাহার সেই স্বাস্থ্য, কোথায় গিয়াছে সেই সৌন্দর্য্য, কুড়ি বছরেই একেবারে যেন বুড়ি হইয়া গেছে। সাদা ধপ্ ধপে গায়ের সে রং নাই, হাতের চুড়ি ঢলঢল করে, জামাগুলা গায়ে আর তেমন আঁট হইয়া বসে না, মাথার সেই একপিঠ চুল এখন হাতের মুঠিতে ধরা যায়।

গ্রামের বহু লোক এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে মরিয়া গিয়াছে। শুধু এই অনিলের বাড়ীতে কেহ এখনও মরে নাই। মরিয়া শুধু বাঁচিয়া আছে। ম্যালেরিয়ার নিয়মকানুন অনিলা এখন সবই জানে। জানে—জ্বরের সময় কতক্ষণ লেপমুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকিতে হয়, জানে পুরানো জ্বরের মেয়াদ কতক্ষণ, জানে জ্বর আসিবার কয় ঘণ্টা পরে ভাত খাইলে জ্বর আর আসে না, জানে টক্ জাতীয় কোনও বস্তু ত হাদের খাইবার উপায় নাই।

অনিলের লক্ষ্য শুধু টাকা রোজগার। জ্বর-জ্বালা, জল-ঝড় কিছুই সে মানে না। মধুবুনীর আড়তে তাহার যাওয়া চাইই।

অনিলা বলে. পরশু জ্বর থেকে উঠেছ, আজ সেখানে নাই-বা গেলে!

অনিল হাসিয়া বলে, তিন গাড়ী চাল আমি ধরে রেখেছি অনিলা। বিক্রী না করতে পারলে লোকসান হয়ে যাবে।

অনিলা বলে, শরীরই যদি যায় ত' কি হবে আমাদের টাকার?

কি হবে? বলিয়া হাসিতে হাসিতে অনিল চলিয়া যায়। কাহারও নিষেধ-বারণ শোনে না।

সেইদিনই চাল তিনগাড়ী বিক্রী করিয়া ফিরিবার সময় অনিলার জন্য একখানি রঙীন শাড়ী সে কিনিয়া আনিল।

শাড়ী পাইয়া যে অনিলা খুসী হইল না তাহা নয়। শাড়ীখানি

নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, শাড়ী পরবার আর আমার সে দেহ কোথায়? সে রূপ কোথায়? এখন আর আমাকে কিছু মানাবে না।

অনিল বলিল, খুব মানাবে। কাল তোমায় এই শাড়ীখানি পরতে হবে।

পরের দিন সেই রঙীন শাড়ীখানা পরিয়া অনিলা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, শাশুড়ীর হঠাৎ সে দিকে নজর পড়িল। বলিলেন, ছেলে আমার অভাব ত' তোমার কিছুই রাখেনি মা, কিন্তু বিয়ে হ'লো আজ পাঁচ ছ' বছর, অন্য মেয়ে হলে এতদিন তিন চার ছেলের মা হতো! কি জানি মা, তোমরা আজকালকার লেখাপড়া জানা মেয়ে, তোমাদের মহিমে তোমরাই জান।

ছেলে না হইবার কথা শাশুড়ী আজকাল তাহাকে প্রায়ই বলিয়া থাকেন। শাশুড়ী চান তাহার একটি ছেলে হোক। কিন্তু হে ভগবান! অনিলা মনে মনে বলে, আমাকে তুমি বাঁচিয়েছ ঠাকুর! নিজের কষ্টই সহ্য করিতে পারি না, তার ওপর নিজের পেটের ছেলেকে যদি দেখি জ্বরে ভুগছে, তখন কি যে করব···তার চেয়ে-এ বরং বেশ আছি।

কিন্তু শাশুড়ীঠাকরুণ কাহারও কোনও কথা শুনিতে চান না। রুগ্ন দুর্ব্বল দেহ লইয়া সেদিন তিনি দু'ক্রোশ হাঁটিয়া নিজেই গেলেন তাড়ুইপুরের কালীর কবচ আনিতে। এ কবচ না কি একেবারে অব্যর্থ। পাঁচটি পয়সা মা'র নামে তুলিয়া রাখিয়া মঙ্গলবার প্রভাতে এই কবচটি ধারণ করিলে বন্ধ্যা নারীও নাকি সন্তান সম্ভবা হইয়া থাকে।

বৌমাকে সেই কবচটি পরাইয়া দিয়া শাশুড়ী বলিলেন, ছেলের জন্যই বিয়ে দেওয়া, তা যদি না হয় মা ত' ছেলের আমি আবার বিয়ে দেব। আমার কাছে লুকানো ছাপানো কথা নেই।

কথাগুলো শুনিয়া অনিলার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। ছেলের মা হইতে কে না চায়!

সেদিন আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। অনিল বাড়ী আসিলে কথাটা তাহাকে বলিতে গিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। বলল, ছেলে যদি না হয় তুমি কি করবে? আমায় তাড়িয়ে দেবে? আবার বিয়ে করবে?

অনিল তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, দূর পাগলী। মা তোমায় কিছু বলেছে বুঝি?

হ্যাঁ। বলিয়া মাথা নাড়িয়া অনিলা কাঁদিতে লাগিল।

অনেক বুঝাইয়া, অনেক আদর করিয়া অনিল তাহাকে চুপ করাইল।

কিন্তু ঠাকুর তাহার মুখরক্ষা করিয়াছেন। অনিলার একটি ছেলে হইয়াছে।—রুগ্না অনিলার ততোধিক রুগ্ন একটি পুত্র সন্তান।

শাশুড়ীঠাকুরাণীর মনস্কামনা পূর্ণ হইয়াছে। ভাদুইপুরের মা-কালীকে প্রণাম করিয়া মনে মনেই সঙ্কল্প করিলেন এইবার একদিন ছেলেকে ও ছেলের মাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া মার মানৎ শোধ করিয়া আসিবেন।

কিন্তু মানৎ শোধ করা দূরে থাক, সন্তানটিকে প্রসব করিয়া অবধি অনিলা কেমন যেন ছটফট করিতেছে, পেটের ভিতর কোথায় যেন কিসের একটা অকথ্য যন্ত্রণায় মনে হইতেছে, যেন সে এখনই মরিয়া যাইবে।

শাশুড়ী বলিলেন, ও কিছু না। প্রথম পোয়াতি, তার উপর দুর্ব্বল শরীর ও রকম হয়েই থাকে।

অনিলা কিন্তু যন্ত্রণাটাকে কিছু না বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না, স্বামীকে সে একটি বার দেখিতে চাহিল।

অনিলের সেদিন মধুবুনীর আড়তে যাওয়া হয় নাই। আঁতুড়-ঘরের দরজায় গিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, কি গো, কি বলছ?

একজন দাই বসিয়াছিল, অনিলা তাহাকে আর লজ্জা করিল না, স্বামীর মুখের পানে তাকাইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, এস!

অনিল তাহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছো?

অনিলা বলিল, ভাল নেই। তুমি একটি কাজ করবে?

কি কাজ?

জ্যেঠামশাইকে একখানি চিঠি লিখে দাও।

জ্যেঠামশাই-এর নাম শুনিয়া অনিল একটুখানি রাগ করিল। বলিল, যে লোক কোনদিন একখানা চিঠি লিখেও খবর নেয় না, তার কাছে চিঠি কেন?

অনিলা বলিল, জ্যেঠামশাই আমাকে বলেছিলেন, জীবনে যেদিন খুব বেশি দুঃখু পাবি সেদিন আমাকে যেন একখানি চিঠি লিখে খবর দিস্।

অনিল একটু অবাক্ হইয়া গেল। বলিল, আজই কি তোমার জীবনে সব চেয়ে বেশি দুঃখের দিন?

অনিলা তাহার আয়ত দুইটি চোখ এবং মাথা একসঙ্গে নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ!

অনিল হাসিয়া বলিল, তোমার পাগলামি এখনও ঘুচল না।

অনিলা বলিল, চিঠি তুমি লিখবে কি না বল।

তা বেশ, তুমি যখন বলছ তখন দিচ্ছি লিখে।

কি লিখবে!

লিখব, আমার একটি ছেলে হয়েছে, তারপর—তারপর আর কি লিখব বল।

অনিলা বলিল, না। তা লিখবে না। আমার নাম দিয়ে লিখে দাও—আজ আমি বড় বিপদে পড়ে আপনাকে ডাকছি জ্যেঠামশাই, যদি পারেন ত' একটিবার এখানে আসবেন। ব্যাস্, আর কোন কথা লিখ না।

অনিল রাজি হইল এবং সেইদিনই একখানি পোষ্টকার্ডে ঠিক সেই কথাগুলিই মণিলালকে লিখিয়া জানাইল।

অনিলার পেটের যন্ত্রণা কিছুতেই যেন কমিতে চায় না। পরের দিন মনে হইল যন্ত্রণা যেন তাহার আরও বাড়িয়াছে।

অনিল দুইজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তারেরা ঔষধ দিলেন। অনিলা সে ঔষধ কিছুতেই খাইতে চাহিল না। সকলে মিলিয়া পীড়াপীড়ি করাতে ঔষধটুক গোপনে ফেলিয়া দিয়া বলিল খাইয়াছি।

দু'দিন কাটিয়া গেল। তিনদিনের দিন অনিলা একেবারে যেন নিস্তেজ হইয়া পড়িল ডাক্তাররা বলিলেন, ঔষধের গুণে ও রকম হয়েছে। যন্ত্রণা কমেছে তাই ঘুম পাচ্ছে।

সকলেই বলিল, দু'রাত্রি ঘুমোতে পারে নি, আহা ঘুমোক ওকে এখন কেউ জাগিয়ো না।

অনিলা নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

সেইদিনই দুপুরে মধুবুনী ষ্টেশনে ট্রেন হইতে নামিয়া হন্তদন্ত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে জ্যোঠামশাই রতনপুর গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। অনিলার কাছে অনিল শুধু তাহার নামই শুনিয়াছে জ্যোঠামশাইকে চোখে সে কখনও দেখে নাই। দেখিল জটাজুটধারী বৃদ্ধ এক সন্ন্যাসী।

মণিলাল আসিয়া বলিল, কোথায় সে? কোথায় আমার মা কোথায়?

অনিল বলিল, ছেলে হবার পর থেকে বড় কাতর হয়ে পড়েছে; এখন বোধ হয় ঘুমোচ্ছে। তা হোক, আপুনি আসুন।

মণিলাল আঁতুড়ের দরজায় গিয়া দাঁড়াইল। অনিলা একাই শুইয়া আছে। দাই তাহার ছেলেটিকে রৌদ্রে শোয়াইবার জন্য বাহিরে লইয়া গিয়াছে।

মণিলাল ডাকিল, অনিলা!

গভীর নিদ্রামগ্ন অনিলার কাছ হইতে কোন সারা না পাইয়া মণিলাল ভিতরে ঢুকিল। অনিলার কাছে গিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া ডাকিল, মা!

বলিয়াই তাহার মুখের পানে তাকাইয়া কেমন যেন সহসা চমকিয়া উঠিয়া মণিলাল চোখ বুজিয়া ধ্যানমগ্নের মত কিয়ৎক্ষণ তাহার শিয়রের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া অনিলের কাছে গিয়া বলিল, ছেলে হয়েছে?

অনিল বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সন্ন্যাসী বলিল, কোথায় সে ছেলে?

কোথায় সে ছেলে?

এই ত! বলিয়া রৌদ্রদীপ্ত উঠানের একপাশে আঙুল বাড়াইয়া অনিল দেখাইয়া দিল।

কই দাও—ছেলেকে আমার কোলে দাও। কঠোর কণ্ঠে সন্ন্যাসী যেন আদেশ করিল! বলিল, দাও আর দেরী ক'র না।

অনিল যন্ত্রচালিতের মত ছেলের দিকে আগাইয়া গেল, তারপর দুই হাত দিয়া অতি সাবধানে কচি ছেলেটিকে তুলিয়া আনিয়া সন্ন্যাসীর প্রসারিত দুই হাতের উপর নামাইয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

মণিলাল বলিল, আমি চললাম। ও আমায় এই জন্যেই ডেকেছিল।

সে কি! ওই কচি ছেলে নিয়ে যাবার জন্যে?—অনিলা! অনিলা! বলিতে বলিতে অনিল ছুটিয়া একেবারে আঁতুড়ে গিয়া ঢুকিল—ছেলে তুমি জ্যেঠামশাইকে নিয়ে যেতে বলেছ অনিলা? অনিলা! অনিলা!

কিন্তু কোথায় অনিলা!

নিসাড় নিঃস্পন্দ প্রসূতির মৃতদেহ পড়িয়া আছে। জ্যেঠামশাই আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে।

অনিল হো হো করিয়া কাঁদিয়া একেবারে আছাড় খাইয়া পড়িল। মা কাঁদিলেন, ভাইএরা কাঁদিল, ধাত্রী সেইখানে ছুটিয়া আসিয়া হায় হায় করিতে লাগিল।

সে বৎসরও তখন বর্ষার পর শরৎ আসিয়াছে।

ঘনশ্যাম শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া ট্রেন চলিয়াছে। ট্রেনের কামরায় বসিয়া আছে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী তাহার প্রসারিত দুই হস্তের উপর নবজাত এক শিশু। দূরে দেখা যায় রতনপুরের সেই শ্মশান! নদীর বাঁকে অস্তসূর্য্যের আলো পড়িয়া সাদা বালি চিক্ চিক্ করিতেছে, আর সেই প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার পাশ দিয়া মনে হয়, যেন কোন্ অভাগিনী জননীর চিতাধূম কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে।

———

—মুক্তিমন্ত্র

মহানন্দ কতদিন ধরিয়া যে এ-ব্যবসা চালাইতেছে সে কথা আজ আর তাহার নিজেরই মনে নাই। কে যে তাহার মা, আর কে যে তাহার বাবা, আজও তাহারা বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, কিছুই সে জানে না। শৈশবে তাহার জ্ঞান হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে দেখিতে পায়—কলিকাতার এক সহরতলীর অতি কদর্য্য একটা বস্তীর মাঝখানে ছোট একটা খোলার বাড়ীতে মানুষ হইতেছে। আর যাহার আশ্রয়ে সে মানুষ হইতেছে, সে মেয়েটির কথা আজও সে

ভুলে নাই। মেয়েটি ছিল অত্যন্ত মোটা আর গায়ের রং ছিল তার কালো। গায়ে এক-গা সোনার গয়না পরিয়া সে ঘুরিয়া বেড়াইত আর সকলের সঙ্গে ঝগড়া করিত। মহানন্দ জানিত, সেই তাহার মা। কিন্তু এমনি মহানন্দর পোড়া কপাল যে, বয়স তখনও তাহার সাত বৎসর পার হয় নাই—এমন দিনে একদিন তাহার সে মা-টিও গেল মরিয়া এবং তাহার মরিবার সঙ্গে সঙ্গে সে জানিল যে, সে তাহার মা নয়। মেয়েটার ছেলেপুলে ছিল না, তাই সে মহানন্দকে কোথা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া বাড়ীতে যেমন করিয়া কুকুর-বেড়াল পোষে, তেমনি করিয়া তাহাকেও সে পুষিতেছিল। যাই হোক মা তাহার মরিবার পরেই যে সে একেবারেই নিরাশ্রয় হইয়া গেল তাহা নয়। যে লোকটাকে সে তাহার মায়ের বাড়ীতে প্রায়ই দেখিত তাহাকে সে ভয় করিত ঠিক বাঘের মতন। যেমন কিম্ভূত কিমাকার ছিল তাহার চেহারা তেমনি ছিল তাহার বাজখাঁই গলার আওয়াজ। ইয়া লম্বা টাঙ্গির মতন বড় বড় দুইটা গোঁফ আর জবাফুলের মত রাঙা রাঙা ডাগর ডাগর দুইটা চোখ। লোকটাকে সবাই বলিত—শেঠজি।

শেঠজির ছিল সেই বস্তিরই একটেরে একটা তাড়ির দোকান। মা তাহার মারা যাইবার পর শেঠজি বলিল, মিঁয়া আর একেলা কোথায় থাকবি ব্যাটা, চোল হামারা সাথ।

সেইদিন হইতে মহানন্দ রহিল সেই তাড়ির দোকানে। শেঠজি নিজেই চার্‌টি রান্না করত, নিজেও খাইত, তাহাকেও খাওয়াইত। সেখানেই খাওয়া, সেইখানেই শোওয়া, সেইখানেই সব। খোলার সেই ছোট বাড়ীটার সঙ্গে সংশ্রব শেঠজির ঘুচিল, তাহারও ঘুচিল।

তাড়ির দুর্গন্ধ প্রথমে প্রথমে মহানন্দর অসহ্য বলিয়া বোধ হইত, যখন-তখন গা বমি-বমি করিত, তাই সে এক-একদিন লুকাইয়া সেখান হইতে ছুটিয়া পলাইয়া আসিত। আসিয়া তাহার মায়ের সেই ছোট খোলার ঘরের চালার কাছটিকে একটি খুঁটি ঠেস্ দিয়া চুপ

করিয়া বসিয়া থাকিত। ঘরটা অনেকদিন খালি পড়িয়াছিল, তাহার পর একদিন দেখিল সেখানে একজন নতুন ভাড়াটে আসিয়াছে।

শেঠজির কাছে মহানন্দ যে খুব কষ্টে ছিল তাহা নয়, খাইতে পাইত, মাঝে মাঝে দু একটা মিষ্টি কথাও যে সে তাহাকে বলিত না তা নয়। রাত্রের তাড়িখোর মাতালদের ঝামেলা মিটিবার পর আহারাদি শেষ করিয়া মাদুর বিছাইয়া তাহারা দু'জনে যখন শয়ন করিত তখন শেঠজি এক-একদিন ডাকিত, মহানন্দো!

মহানন্দ ভয়ে ভয়ে বলিত, উঁ।

শেঠজি বলিত, ঘুম যাও ব্যাটা, ঘুম যাও। হিঁয়া কাম্-উম্ শিখো। ই-তাড়িকা দোকান তোম্হাকেই হামি দিয়ে যাবো। বহুৎ রুপেয়া কামাবে, সাধি কোরবে, ছেলিয়া হোবে, বাস, আউর কেরা!—ঘুম যাও ব্যাটা ঘুম্ যাও।

মহানন্দ চুপ করিয়া শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

কিন্তু মহানন্দ বোধকরি ছিল বাঙ্গালী, তাহার মাও কথা কহিত বাংলায়, তাই শেঠজির এই ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দী কথা সব সময়ে সে ভাল বুঝিতে পারিত না। ছেলেমানুষ এক-একদিন এই লইয়া সে বড় বিপদে পড়িত।

রান্নার সময় শেঠজি একদিন হুকুম করিল, মহানন্দ, বর্ত্তন লে আও।

বেচারা মহানন্দ। বর্ত্তন কাহাকে বলে জানে না।

দু'তিনবার বলিবার পরেও শেঠজি যখন দেখিল সে বোকার মত হাঁ করিয়া এদিক-ওদিক তাকাইতেছে তখন সে আঙ্গুল বাড়াইয়া এলুমিনিয়ামের হাঁড়িটা দূর হইতে দেখাইয়া বলিল, আধমে দেখতে পাও না! ওহি ত' বর্ত্তন।

ঘরের কোণে ঝাঁটাগাছটা পড়িয়াছিল, মহানন্দ ভয়ে ভয়ে তাহার লইয়া আসিল। কিন্তু এ বিভ্রাট যে কেন বাধিল শেঠজির মস্তিকে

তাহা প্রবেশ করিল না। সে তখন রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া গেছে। সেই ঝাঁটা লইয়াই মহানন্দর পিঠের উপর ঘা দুই বসাইয়া দিয়া বলিল, তোম ভাগো হিঁয়াসে? তোম কুছ কামরা নেহি।

মহানন্দ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া খানিকটা কাঁদিল, তাহার পর আবার দেখা গেল, শেঠজির হুকুম মত এটা ওটা সে তাহার হাতের কাছে আগাইয়া দিতেছে।

এমনি করিয়া প্রায় বছর-খানেক মহানন্দ শেঠজির কাছে কাটাইল। তাহার পর হঠাৎ একদিন দেখা গেল, সে পলায়ন করিয়াছে। পলায়ন করিবার গুরুতর কোনোও ক রণ যে কিছু ঘটিয়াছে তাহা নয়। শেঠজি গিয়াছিল বাজারে। টাকাকড়ি সম্বন্ধে শেঠজি বরাবরই একটুখানি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করিয়াই চলে, কিন্তু সেদিন বোধকরি মনের ভুলেই সে পাঁচটি টাকা তাহার ক্যাশবাক্সের উপরে নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। এই টাকা পাঁচটিই হইল মহানন্দের কাল। ধীরে ধীরে ক্যাশবাক্সের কাছে গিয়া টাকা কয়টি একবার সে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল, তাহার পর কি যে সে ভাবিল কে জানে, টাকা পাঁচটি হাতে লইয়া মহানন্দ সেই যে তাড়ির দোকান হইতে বাহির হইয়া গেল, আর সে জীবনে কোনদিন সেখানে ফিরিল না।

এই ত' গেল মহানন্দের শৈশবের ইতিহাস।

শেঠজির কাছে থাকিলে আজ তাড়ির দোকানের মালিক হইয়া কি যে করিত, কে জানে, কিন্তু যে লোকটাকে সে বাঘের মত ভয় করিত, তাহারই টাকা চুরি করিয়া একবার যখন সে সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়ছে, পুনরায় সেখানে ফিরিয়া যাওয়া তাহার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই।

এত বড় এই শহরের মধ্যে নিরাশ্রয় নিরবলম্বন বালক মহানন্দ কেমন করিয়া যে তাহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া এত বড়টি হইয়া

উঠিয়াছে, একটি একটি করিয়া সে-সব কাহিনী বলিতে গেলে সে অনেক কথা। অনাহারে অনিদ্রায় তাহার কতদিন কাটিয়াছে পথের ধারে. গাছের তলায়। হাসপাতালে একবার মরণাপন্ন কাহিল হইয়া তাহার মনে হইয়াছে শেঠজির কাছে ফিরিয়া যায়। কিন্তু তাহার সেই বড় বড় দুইটা চোখ আর গোঁফজোড়টাই কথা মনে হইতেই ভাবিয়াছে — কাজ নাই।

এতদিন পরে মহানন্দকে আজ আর চিনিবার উপায় নাই। বয়স এখন তাহার প্রায় চল্লিশ। কালো কুচকুচে গায়ের রং বুকখানা চওড়া, সুস্থ সবল মাংসপেশী, হাত পা নিটোল, শক্ত যেন লোহা। আজ তাহারও ঠিক শেঠজির মতই মুখের উপর টাঙ্গির মত এক জোড়া গোঁফ গজাইয়াছে। এক একদিন আর্শীতে সে তাহাই দেখে, আর তাহার স্ত্রীকে বলে. আজ থেকে আমায় তুই শেঠজি বলে ডাকবি।

গোঁফজোড়াটা পাকায় এই কথা বলে আর হাসে।

কুসুম ইহার ঠিক মানে বুঝিতে পারে না। বুঝিবার চেষ্টাও করে না। বলে, হাসতে তোমার লজ্জা করে না। মেয়েটা যে ওদিকে মারা যাচ্ছে, কিছু টাকা হলেই তাকে এখানে আনিয়ে চিকিচ্ছে-টিকিচ্ছে করাই—সে কথা বুঝি ভুলে গেছ ?

যে মহানন্দের দুঃখ সহজে হয় না, সে মহানন্দেরও মুখ দিয়া একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। বলিল, হুঁ তা জানি। আজ পাঁচদিন ধরে চেষ্টা ত' করছি আমি খুব, কিন্তু কোনো ব্যাটা আজকাল পকেটে পয়সা নিয়ে বেরোয় না।

কুসুম বলিল, না বাপু একটু ভালো করে ছাখো, নইলে মেয়েটা আমাদের আর বাঁচবে না।

মহানন্দ তাহা জানে এবং এ দুনিয়ার মধ্যে ভাল যদি কাহাকেও সে ভালবাসে ত' সে তাহার একমাত্র এই কন্যাটিকে।

সেদিন তাই সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইল, টাকা

সে আজ যেমন করিয়া হোক, আনিবেই।

মহানন্দের টাকা উপার্জন করিবার পন্থা—জনসাধারণের কাছে বলিবার নয়। সহরের প্রসিদ্ধ গুণ্ডা আব্বাসের কাছে তাহার হাতে-কলমে শিক্ষা। পকেট কাটিতে, নিরীহ পথিকের কাছ হইতে জোর করিয়া টাকা ছিনাইয়া লইতে ছোরা মারিয়া নির্ম্মমভাবে মানুষকে ঘায়েল করিতে সে অদ্বিতীয়! আব্বাসকে গুণ্ডা আইনে কলকাতা হইতে যখন বাহির করিয়া দেওয়া হয়, মহানন্দ নিজেই তাহার নূতন দল গঠন করে। সেই অবধি সে তাহার নিজের দলবল লইয়া স্বাধীনভাবে কাজ চালাইতেছে।

রোজগার তাহার মন্দ হইত না, কিন্তু গত কয়েকমাস হইতে মেয়েটা তাহার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া অবধি মনের অবস্থা মহানন্দের মোটেই ভাল নয়, লোকজনের মাঝখানে পকেট কাটিতে গিয়া আজকাল হয়ত সে পথের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, গালে হাত দিয়া ভাবে—এইবার কিছু মোটা টাকা সংগ্রহ করিয়া সে তাহার এই ঘৃণিত ব্যবসা পরিত্যাগ করিবে।

এ-কথা কোনদিনই হয়ত সে ভাবিত না, কিন্তু সেদিন তাহার স্ত্রী কুসুম তাহাকে কথায় কথায় বলিয়াছে—কত লোকের মনে তুমি কষ্ট দাও, জানো? সেই জন্যই তোমার এত কষ্ট।

কষ্ট ত' তাহার আর কিছুর জন্য নয়, কষ্ট শুধু তাহার মেয়েটা কষ্ট পাইতেছে বলিয়া।

মেয়েটার বয়স যে খুব বেশী তাহা নয়। চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ের বিবাহ হয়ত এখন না দিলেও চলিত, কিন্তু বিবাহ তাহার দিয়াছে সে নানা কারণে।

প্রথম কারণ—তাহার বাবার এই অর্থোপার্জ্জনের পন্থাটা সে পছন্দ করিত। তাহার উপর একদিন এক মেলায় গিয়া ছোট একটা মেয়ের কান হইতে দুইটা সোনার মাকড়ি মহানন্দ ছিনাইয়া

লইয়াছিল। সেই মাকড়ি বাড়ী আসিয়া সে তাহার মেয়েকে দেয়।

সোনার মাকড়ি পাইয়া মেয়েটা প্রথমে খুব খুসীই হইয়াছিল, কিন্তু সে দুটা সে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিতে দেখিতে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ইস্। এতে যে রক্ত লেগে রয়েছে বাবা।

এই বলিয়া মাকড়ি দুটা সে তাহার বাবার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, না বাবা, এ মাকড়ি আমি পরব না কিছুতেই।

সে মাকড়ি সে আর পরেও নাই।

এমনি সব নানা কারণে মেয়েটাকে সে তাহার চোখের সুমুখ হইতে বিদায় করিবার জন্য নৈহাটির চটকলের একটি ছোকরায় সঙ্গে বিবাহ দিয়া সেইখানেই তাহাকে সে পাঠাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু সেই অবধি কাহারও মনেই সুখ নাই। মহানন্দও এদিকে ভাল করিয়া রোজগার করিতে পারিতেছে না, ওদিকে স্বামীর ঘর করিতে গিয়া মেয়েটার অসুখ।

কুসুম বলিয়াছে, লোকের মনে সে কষ্ট দেয় বলিয়াই তাহার এত কষ্ট। তাই এক-এক সময় মহানন্দের মনে হয় এবার সে অন্ততঃ একজনকেও সুখী করিবে। কিন্তু কাহাকে সে কেমন করিয়া সুখী করিবে কিছুই বুঝিতে পারবে না।

মহানন্দ ঝাড়াঝুড়ি দিয়া উঠিল—না, এরকম দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিলে এবার হয়ত তাহাকে সপরিবারে উপবাসে মরিতে হইবে—আজ তাহার টাকা চাই, প্রচুর টাকা।

দু'জন সাকরেদ সেদিন তাহার সঙ্গে গিয়াছিল। তাহাদের কাছে ডাকিয়া বলিল, আজ আর পকেট কাটব না, চল কোথাও মোটা টাকার চেষ্টা দেখি।

সাকরেদ দু'জন—একজনের নাম ভীম, একজনের নাম অর্জ্জুন। এতদিন পরে সর্দ্দারের মন ফিরিয়াছে দেখিয়া তাহারাও খুশী হইল। কিছুদিন ধরিয়া তাহাদেরও কষ্টের সীমা ছিল না। পকেট কাটিয়া

এখান-ওখান হইতে যৎসামান্য যাহা তাহারা রোজগার করিয়া আনিত—সবই যাইত সর্দ্দারের পেটে। সর্দ্দারেরই কুলায় না ত' তাহারা পাইবে কি!

পথ চলিতে চলিতে ভীম বলিল, ছাখ অর্জ্জুন, আজ যদি মোটা টাকা কোথাও পাওয়া যায়, আর সর্দ্দার-ব্যাটা আমাদের ভাগ না দেয় তা' হলে কি করবি বল দেখি?

অর্জ্জুন তাহার তলপেটে খোঁজা ছোরাটা দেখাইয়া বলিল, আজ তাহলে এই ছোরাটা আমাদের সর্দ্দারেরই তলপেটে দেবো চলিয়ে।

ভীম ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ঠিক বলেছিস, আজ যদি কিছু না দিতে চায় ত' ওকেই আমরা খুন করব।

তাহাদের এই ভীষণ ষড়যন্ত্রের কথা মহানন্দ কিছুই জানিল না সে তখন আগে আগে রাস্তার মোড় পার হইয়া অনেক দূরে চালয়া গেছে।

*　　　*　　　*

সারাদিন এখান-ওখান এ রাস্তা সে রাস্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যার তাহাদের শিকার মিলিল।

বড়বাজারের কি একটা গলির ভিতর দিয়া হিন্দুস্থানী এক দারোয়ান কোথায় কোন্ দোকান হইতে নোটে ও টাকায় মস্ত বড একটা থলে ভর্ত্তি করিয়া কোথায় লইয়া যাইতেছিল। বেচারা একেবারে মহানন্দর কবলে গিয়া পড়িল।

বাস! মুহূর্ত্তের জন্য গলির মাথায় একটা গোলমাল উঠিল, হৈ হৈ করিয়া লোকজন আসিয়া জড়ো হইল—চোর চোর করিয়া লোকে চারিদিকে হল্লা করিতে লাগিল, তাহার পর দেখা গেল, পথের মাঝখানে আহাত দারোয়ান পড়িয়া আছে, আর কোথায়-বা চোর আর কোথায়-বা তাহার টাকা' থলি।

*　　　*　　　*

মেটিয়াবুরুজের কাছাকাছি একটা নিৰ্জ্জন জায়গার উপর দিয়া হন হন করিয়া তাহারা তিনজনে হাঁটিয়া চলিতেছিল। মহানন্দর হাতে টাকার থলি, আর তাহার দুই পাশে ভীম আর অর্জ্জুন।

মহানন্দর মেয়ের অসুখ। তাহার ওই একমাত্র কন্যাকে বাঁচাইতে হইবে। আজ তাহার অনেক টাকার প্রয়োজন। তাই সে ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছিল—ভীম অর্জ্জুনকে কিছু সে দিবে না, নিজেই সব আত্মসাৎ করিবে।

ওদিকে পথ চলিতে চলিতে ভীম তাহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অনুচ্চকণ্ঠে ক্রমাগত বলিয়া চলিয়াছে—আমার যা কষ্ট হয়েছে সর্দ্দার সে আর তোমাকে কি বলব। ধর সেই সেদিন—সেই কবে তার ঠিক নেই—মুনি—ব্যাগটাতে আড়াইটি টাকা ছিল। ছেলেটার এমন অসুখ, ডাক্তার দেখাতে হবে, হাতে একটি পয়সা নেই। ডাক্তার না দেখালে ছেলেটা আমার ঠিক মরে যাবে সর্দ্দার।

অর্জ্জুন বলিল, আরে তোর ত' ছেলে! আর আমার জানিস? আমার বৌ-এর মুখ দিয়ে আজ ক'দিন ধরে চাপ চাপ রক্ত উঠছে। চিকিচ্ছে টিকিচ্ছে না করলে—দেবে কোনদিন শুইয়ে, ব্যস, তখন আমাকে দু'বেলা কে যে রেঁধে দেবে, কে জানে। আমাকে আজ কিছু টাকা তোমাকে দিতেই হবে সর্দ্দার।

মহানন্দ দু'জনেরই কথা শুনিতে শুনিতে আগাইয়া চলিল। ভীম ও অর্জ্জুনের আগেই পরামর্শ হইয়াছে—ভাল কথায় টাকা যদি সর্দ্দার তাহাদের না দেয় তাহা হইলে আজ তাহারা সর্দ্দারের উপরেই ছুরি চালাইবে। ভীম ও অর্জ্জুন পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া চোখ টিপিয়া বোধ করি তাহারই ইঙ্গিত করিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছুরি চালাইতে হইল না। মহানন্দ কি যে ভাবিল কে জানে, হঠাৎ পিছন ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোর কার অসুখ বললি ভীম?

ভীম বলিল, আমার ছেলের সর্দ্দার। সেই যে ছোট ছেলেটা,—যেটাকে তুমি দেখেছ।

আর তোর?—বলিয়া মহানন্দ অর্জ্জুনের দিকে মুখ ফিরাইল। অর্জ্জুন বলিল, আমার বৌ-এর সর্দ্দার, ভারি খারাপ ব্যামো।—মুখ দিয়ে চাপ চাপ রক্ত উঠছে।

তাহা হইলে দুঃখী সে শুধু নিজে নয়, ইহারাও দুঃখী। মহানন্দ জীবনে কাহাকেও খুসী করে নাই, মানুষের মনে শুধু কষ্টই দিয়াছে,—ইহাই তাহার স্ত্রীর অভিযোগ। যাই হোক আজ সে ভীম অর্জ্জুনকে খুসী করিবে।

হাতের থলেটা মহানন্দ ইহাদের দুজনের মাঝখানে তুলিয়া ধরিল। তারপর বলিল, এইটা পেলে তোরা খুসী হোস ভীম অর্জ্জুন?

আকাশে বোধকরি চাঁদ উঠিয়াছিল। তাহারই আলোয় মহানন্দ দেখিল—ভীম অর্জ্জুনের দুইখানা মুখ হাসিতে ও আনন্দে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

তবে এই নে তোরা দুজনে ভাগাভাগি করে। বলিয়া টাকা ও নোটের থলিটা মহানন্দ তাহাদের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া হন হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

* * *

স্ত্রী তাহার ঠিকই বলিয়াছিল। এতদিন সত্যই সে কাহাকেও খুসী করিতে পারে নাই এবং সে জন্যই তাহার এত দুঃখ। আজ সে ভীম ও অর্জ্জুনকে খুসী করিয়া মনে মনে অনেকখানি আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতে লাগিল। টাকাতে কিছুই হয় না। এইবার বোধকরি মানুষ ও দেবতার আশীর্ব্বাদে কন্যা তাহার আপনা হইতেই রোগমুক্ত হইবে।

মহানন্দ সেদিন যখন ফিরিল তখন রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়াছে। কান্নার শব্দে সহসা সচকিত হইয়া সে ঘরে ঢুকিয়াই দেখিল স্ত্রী

তাহার উপুড় হইয়া শুইয়া শুইয়া কাঁদিতেছে। মহানন্দ তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াতেই যে মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ স্ত্রী তাহাকে জানাইল তাহা যে তাহাকে আজ শুনিতে হইবে—ইহা সে কল্পনাও করে নাই।

শুনিল, নৈহাটি হইতে এইমাত্র একটা লোক আসিয়া সংবাদ দিয়া গিয়াছে যে, তাহাদের আদরিণী কন্যা আর ইহজগতে নাই। গত রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।

স্তব্ধ মুহ্যমান মহানন্দ কাঠ হইয়া সেইখানেই কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়' দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর হন্ হন্ করিয়া ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। কোথায় গেল কাহাকেও কিছু বলিয়া গেল না। ভীম ও অর্জ্জুনের কাছ হইতে টাকার থলিটা সে কাড়িয়া লইবার জন্যই ছুটিল কিনা তাই বা কে জানে।

———

—সঙীন-কাঁটা

হরিহর বিবাহ করিল বিনোদিনীকে।

কিন্তু বিনোদিনীকে বিবাহ করিবার কথা হরিহরের নয়। হরিহর গরীব, আর বিনোদিনী বড়লোকের মেয়ে। বিবাহটা মনে হয় যেন ঠিক দৈব দুর্ব্বিপাকে ঘটিয়া গেছে।

বিবাহের পর বিনোদিনীর বাড়ীতে এই কথাটা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতে লাগিল।

বিনোদিনীর মা বলিলেন, নাঃ, বিয়েটা বোধহয় ভাল হ'লো না!

তাহার বাবা বলিলেন, কি আর করবে, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ।

এবং শেষ পর্য্যন্ত এই প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ বলিয়াই তাহারা চুপ করিয়াছিল, মাস-তিনেক পরে হঠাৎ আবার সেই কথাটাই উঠিয়া পড়িল।

উঠিয়া পড়িল হরিহরের একখানি চিঠি আসিবার সঙ্গে-সঙ্গেই।

হরির তাহার শ্বশুরকে লিখিয়াছে ঃ

এ বৎসর আমার এম-এ পরীক্ষার বৎসর। কিন্তু আমার আর্থিক অবস্থার কথা আপনি সবই জানেন। ফিসের টাকা যদি জমা দিতে না পারি ত' এত কষ্ট করিয়া পড়া আমার সবই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। অথচ পরীক্ষা আমার না দিলেও নয়। সেইজন্য আপনাকে আমি আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি—আমার এই চিঠিখানি পাইবামাত্র দয়া করিয়া পঞ্চাশটি টাকা আমায় দিবেন। আশা করি আপনি আমায় বিমুখ করিবেন।

চিঠি পাইয়াই শ্বশুর ডাকিলেন, ওগো দেখে যাও।

শ্বাশুড়ী কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, কি দেখবো ?

এই ছাখো জামাই-এর চিঠি। কি লিখেছে দেখেছো ? পঞ্চাশটি টাকা চাই। পাঁচ টাকা নয়, দশ টাকা নয়, একেবারে পঞ্চাশ। এই জন্যেই ফন্দি-ফিকির করে আমার বাড়ীতে ওর বিয়ে করা। বুঝতে পেরেছো ?

শ্বাশুড়ী বলিলেন, আমি বুঝেছি অনেকদিন। এখন তুমি বোঝো।

এই বলিয়া শ্বাশুড়ী সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

শ্বশুর ভাবিতে লাগিলেন—কি করা যায়!

পঞ্চাশ টাকা তাঁহার কাছে কিছুই নয়। ইচ্ছা করিলেই তিনি পাঠাইতে পারিতেন, কিন্তু পাঠাইলেন না।

হরিহর ওদিকে বসিয়া ছিল টাকার আশায়।

দিনের পর দিন গেল, সপ্তাহের পর সপ্তাহ পার হইল, কিন্তু শ্বশুরের কাছ হইতে তাহার না আসিল টাকা, না আসিল চিঠি হরিহর ভাবিল, শ্বশুরের বেতো শরীর, বর্ষার হাওয়া লাগিয়া অসুখ-বিসুখ হয় ত' বাড়িয়া থাকিবে, তাই এ বিলম্ব। হরিহর তখন তাহার স্ত্রী বিনোদিনীকে একখানা লিখিল।

লিখিল :

শ্বশুর মহাশয়কে একখানা চিঠি দিয়াছি। জবাব না পাইয়া বড়ই চিন্তিত রহিয়াছি। তাঁহার শরীর কেমন আছে লিখিবে। আমার আশঙ্কা হইতেছে হয়ত' তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন। আমার এম-এ পরীক্ষার পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছি, তাহা না হইলে আমি নিজেই একদিন যাইতাম।

একটা কথা তোমাকে লিখিতে লজ্জা হইতেছে, তবু লিখিলাম। পঞ্চাশটি টাকা না হইলে আমার আর এ বৎসর পরীক্ষা দেওয়া চলিবে না। আমার বাবার অবস্থা তুমি জানো। আমারা নিতান্ত গরীব। প্রাইভেট পড়াইয়া কলিকাতার খরচ চালাইয়া নিজেই কোনরকমে অতিকষ্টে এতদিন চালাইলাম, কিন্তু একসঙ্গে পঞ্চাশটি টাকা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে শক্ত। শুধু শক্ত কেন, অসম্ভব। কাজেই তোমার বাবার শরণাপন্ন হইয়াছি। অথচ আমার ফিস জমা দিবার শেষ দিন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। আর মাত্র দশদিন বাকি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তোমার বাবার চিঠি বা টাকা কিছুই পাইলাম না। কি ব্যাপার হইয়াছে আমাকে জানাইলে সুখী হইব। তোমার মার কাছে কথাটা যদি একবার কৌশল করিয়া তুলিতে পারো ত' বড় ভাল হয়। তোমার পত্রের আশায় রহিলাম।

এই পর্যন্ত লিখিয়া পরে যে-সব কথা লিখিয়াছে সে-সব কথা আর আপনাদের জানাইবার প্রয়োজন নাই। সদ্য বিবাহিত স্বামী লিখিয়াছে তাহার যুবতী স্ত্রীকে। কাজেই তাহা গোপনীয়।

চিঠির প্রথম দিকটা পড়িয়া বিনোদিনী নাক্ সিট্‌কাইয়া রাগ করিয়া আপন মনেই বলিয়া উঠিল, মরণ আর কি! এ-সব কথা আমার কাছে কেন? আমি কি করতে পারি!

কিন্তু তাহার পরের অংশটা পড়িয়া সে খুশি হইয়া চিঠির জবাব

লিখিতে বসিল। খানিকটা লিখিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। টাকার কথা কি লিখিবে?

অথচ মা বাবাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেও লজ্জা হয়।

শেষে অনেক ভাবিয়া সে একটা বুদ্ধি ঠাওরাইল। চিঠির যে-অংশটা কাহাকেও দেখাইবার নয়, সেই অংশটা ছিঁড়িয়া রাখিয়া বাকিটা হাতে লইয়া সে তাহার মার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

মুখ তুলিয়া মা বলিলেন, কি?

এই ছাখো কি লিখছে। বলিয়া চিঠিখানি বিনোদিনী তাহার মার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিল। মা পড়িদা দেখিলেন। বলিলেন, আমি এর আর কি করবো মা? দেখাইগে তোর বাবাকে। দেখি কি বলে।

বিনোদিনীর বাবা চিঠিখানি পড়িয়াই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। চিঠিখানি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ভেবেছে আমি যেন টাকার গাছ! পারবো না টাকা পাঠাতে। একবাব দিলে আবার দশবার চেয়ে বসবে। তা জানো?

বিনোদিনীর মা বলিলেন, জবাব ত' একটা লিখতে হবে! কি লিখবে বলে দাও।

লিখে দাও আমি পারবো না, আমার টাকা নেই। ব্যস, সোজা সত্যি কথা।

ইহার উপর আর কথা চলে না। বিনাদিনী লিখিল:

বাবার হাতে এখন টাকা নাই। কাজেই টাকা তিনি এখন দিতে পারিবেন না।

চিঠি পাইয়া হরিহর মাথায় হাত দিয়া বসিল।

বড় লোকের বাড়ি বিবাহ করিয়া শেষ পর্যন্ত তাহার ফল যে এই হইবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। এত কষ্টে এতদিন ধরিয়া পড়িয়াছে, এম-এ পাশ তাহাকে করিতেই হইবে। আর মাত্র পাঁচ-ছ দিন বাকি।

হরিহর তৎক্ষণাৎ বাড়ি রওনা হইল। বৃদ্ধ পিতা তাহার নিরুপায়। বলিলেন, কি করবো বাবা কিছুই ত' বুঝতে পারছি না। তার চেয়ে তুই এক কাজ কর। শ্বশুরবাড়ি যা, বৌমাকে গিয়ে চুপি চুপি বল্—তোমার একটি গয়না দাও, বন্ধক দিয়ে পরীক্ষটা এখন দিই, তারপর আবার ছাড়িয়ে দেবো। এছাড়া আর ত' কোন উপায় দেখছি না বাবা!

হরিহর তাহাই করিল।

কিন্তু সেখানে গিয়া দেখে, তাহা হইবার নয়।

বিনোদিনী বলিল, যা আমার গায়ে আছে তা দিতে পারি না, মা বকবে। আর বাকি সব ভাল ভাল গয়না আছে মা'র কাছে। মাকে তাহলে একবার জিজ্ঞাসা করি।

এই মাকে জিজ্ঞাসা করিতে গিয়াই বাধিল গোলমাল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন বাবাকে। বাবা বলিলেন, দূর করে দাও ওকে বাড়ি থেকে। এমন জামাই আমার চাই না।

মা বলিলেন, ওগো থামো থামো, জামাই শুনতে পাবে যে?

শুনুক্ না! শুনিয়ে শুনিয়েই ত' বলছি। বাড়িতে খাবার নেই। গয়না বেঁচে বেঁচে খাবার মতলব!

কথাটা হরিহর শুনিল। শুনিয়া রাগ করিল।

রাগ করিবার কথাই।

বলিল, বিনোদিনীকে আমি নিয়ে যাব। এখানে আর রাখবো না।

শাশুড়ি বলিলেন, এই শোনা জামাই কি বলছে।

শ্বশুর বললেন, হ্যাঁ শুনেছি। জামাইকে বলে দাও—মেয়ে আমি পাঠাবো। এত কষ্টে এতগুলি গয়না গড়িয়ে দিলাম, লক্ষ্মী-ছাড়া দু'দিনে তাই বেঁচে মেরে দেবে।

তাই শুনিয়া জামাই রাগ করিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

এবং সেই যে আসিল একটি দিনের তরেও আর সেখানে ফিরিয়া গেলন।।

হরিহরের এম এ পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই! কি কষ্টে যে তাহার দিন চলিতেছে তাহা একমাত্র সেই জানে। কলকাতা হইতে সে গ্রামে ফিরিয়া গেছে।

চাকরির জন্য খবরের কাগজ দেখিয়া দেখিয়া দরখাস্ত করিয়াছে বিস্তর। 'তাহার কতক' বা জবাব আসিয়াছে, কতক আসে নাই।

দিন আর কিছুতেই কাটে না!

অবশেষে দিন কাটাইবার একটা ব্যবস্থা সে করিয়াছে?

শহরে যখন সে ম্যাট্রিকুলেশন পড়িত, তাহাদেরই গ্রামের একটি ছেলে ছিল তাহার সহপাঠি। ছেলেটির নাম নির্মল। একসঙ্গে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া নির্মল আর পড়িতে পারে নাই। পশ্চিমের কোথায় কোন কারখানায় সে কাজে ঢুকিয়াছিল। এখন সে সেখানকার বড়বাবু! একশ' টাকা বেতন।

একশ' টাকা বেতন পায়, কিন্তু স্ত্রীপুত্র তার এইখানেই আছে।

মাসে একবার করিয়া নির্মল গ্রামে আসে। সেবার আসিয়া সে হরিহরকে বলিয়া গেছে—দেখিস ভাই, এরা রইলো। মাঝে মাঝে একবার করে বেড়াতে যাস।

হরিহর তাই আজকাল নির্মলের বাড়ি বেড়াইতে যায়। বাড়িতে তাহার যুবতা স্ত্রী প্রতিভা, বছর দুই এর একটি ছেলে, আর প্রতিভার বোন—পারুল ছাড়া আর কেহ নাই।

প্রতিভা ও পারুল দু'জনেই হরিহরের সঙ্গে কথা বলে। নির্মল তাহার সমবয়সী হইলেও প্রতিভাকে ডাকে বৌদি বলিয়া।

হরিহর বলে, আচ্ছা বৌদি, আপনার এ বোনটিকে নিজের কাছে এনে রেখেছেন কেন বলুন ত?

প্রতিভা হাসিয়া বলে, তোমাদের মতন বিদ্বান একটা ছোকরা যদি ধরতে পারে ত' ওর একটা হিল্লে হয়ে যাবে। শুধু এই জন্যে। বাবা গরীব, বিয়ে এখনও ত' দিতে পারেন নি।

এই বলিয়া তাহার সে চমৎকার মুখে বড় মিষ্টি হাসি হাসিতে থাকে।

হরিহরও হাসিয়া বলে, কিন্তু বিদ্বান যে ছোকরাটি এখানে অনবরত আসা-যাওয়া করছে, বিয়ে ত' তার হয়ে গেছে।

প্রতিভা বলে, বিয়ে যে হয়ে গেছে তা সবাই জানে। আবার বৌ যে গরীবের মেয়ে তোমার মত গরীব স্বামীকে পছন্দ হয় নি তাও ত' কারও জানতে বাকি নেই।

প্রতিভা যে কিসের ইঙ্গিত করিতেছে হরিহর তাহা বুঝিল। মুখ ফিরাইতেই দেখিল, ওদিকে দরজাটা একটুখানি ফাঁক করিয়া আড়ালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পারুল সবই শুনিতেছে। হরিহরের সঙ্গে চোখা-চোখি হইতেই ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া সে সরিয়া পড়িল।

পারুল সুন্দরী। ছিপ্ছিপে গড়ন; চোখ দুইটি ঢলঢলে দাঁতগুলি চমৎকার। বিবাহের বয়স হইয়াছে, অথচ এখনও বিবাহ হয় নাই বলিয়া এই বয়সের মেয়েদের মুখে যেমন একটি সলজ্জ বিষণ্ণতার ছাপ পড়ে তাহারও মুখে সে-ছাপ পড়িয়াছে।

প্রতিভা বলিল, পারুল আমাদের আরও সুন্দরী মেয়ে হতো ঠাকুরপো, নিজের বোন বলে অহঙ্কার করছি না। মামার বাড়ি গিয়ে হতভাগী কি যে ম্যালেরিয়া ধরিয়ে আনলে এখনও জ্বর আসছে; সেইজন্যেই আরও বেশি করে ওকে আমি এখানে এনে রাখলাম।

হরিহর বলিল, আপনি একা থাকেন, একজন সঙ্গীও ত' দরকার।

প্রতিভা বলিল, হ্যাঁ তাও বটে। কিন্তু বিয়ে হলেই ত' পরের বাড়ি চলে যাবে ভাই, সঙ্গী আর তখন পাবো কোথায়?

পুনরায় বিবাহ করিবার কথা হরিহর কোনোদিনই ভাবে নাই, কিন্তু হঠাৎ সেদিন প্রতিভার কথা শুনিয়াই বোধকরি কথাটা সে বারম্বার ভাবিতে লাগিল। পারুলকে তাহার মন্দ লাগে না, তাহার উপর বড়লোকের মেয়ে সে নয়। বিবাহ করিতেই বা দোষ কি? বিদিনীকে তাহার বাবা যখন এ গরীবের বাড়ি পাঠাইবেই না, থাক্ সে বড়লোকের মেয়ে বড়লোকের বাড়িতেই বিবাহ যদি হয় ত-

পারুলকেই করিবে।

নির্মলের বাড়ি গিয়া হরিহর দেখিল, রান্নাঘরে বসিয়া প্রতিভা রান্না করিতেছে, আর এ-ঘরে খাটের উপর শুইয়া শুইয়া পারুল থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। গায়ে একটা র‍্যাপার জড়ানো, মাথা নাড়িয়া বলিতেছে জল। দিদি, এক গ্লাস জল দাও না।

কথাটা সে এত আস্তে বলিল যে, ও-ঘরে দিদির কানে গিয়া তাহা পৌঁছিল না। হরিহর নিজেই তাড়াতাড়ি কুঁজো হইতে এক গ্লাস জল গড়াইয়া পারুলের কাছে গিয়া বলিল, নাও।

পারুল হাত বাড়াইয়া চোখ চাহিতেই দেখিল, হরিহর।

তৎক্ষণাৎ ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, আপনি! আপনি কেন?

দিদি তোমার রান্না করছেন। থাক্ থাক্ হাত তোমার কাঁপছে, আমার হাতেই খাও না।

এত সৌভাগ্য পারুলের কোনোদিনই হয় নাই। হরিহরের হাতেই জলটুকু খাইয়া আবার সে শুইয়া পড়িল। কিন্তু এবার আর সে চোখ বুজিতে পারিল না। আয়ত সেই দুইটি চমৎকার চক্ষুর সকরুণ দৃষ্টি হরিহরের উপর স্থির নিবদ্ধ হইয়াই রহিল। জ্বর হইয়াছে বলিয়া তাই, অন্য সময় হইলে এমন ভাবে কখনই সে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে পারিত না। হরিহর বলিল, জ্বর কি খুব বেশি এসেছে?

বলিয়া সে তাহার কপালে হাত দিয়া দেখিল। বলিল, গায়ে একটা লেপ দেবে?

হ্যাঁ, ওই যে ওখানে আছে।

লেপ চাপা দিয়া হরিহর বলিল, চুপ করে একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর।

ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিয়া পারুল বলিল এখন ত' আসবে না।

সয়ুখ খাও ত'?

খাই। কুইনিন্। ভারি তেঁতো।

হরিহরও হাসিয়া বলিল, কুইনিন্ আবার মিষ্টি হয় কবে।

দুজনেই চুপ করিয়া ছিল। হরিহর জিজ্ঞাসা করিল, আর জল খাবে?

খাইবার তেমন ইচ্ছা ছিল না, তবু সে মাথা নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

এবারও তেমনি জলটা হরিহর তাহাকে খাওয়াইয়া দিতেছিল, এমন সময়ে ঘরে ঢুকিল প্রতিভা। পারুল লজ্জায় যেন মরিয়া গেল, আর গ্লাসটা হরিহরের হাত হইতে তখন পড়িয়া যাইবার মত অবস্থা!

প্রতিভা বলিল, জ্বর এসেছে ত'? কাল রাত্রিরে যখন ভাত খেলি আমি তখনই জানি।

জলের গ্লাসটা হাত হইতে নামাইয়া হরিহর উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, এ-ঘরে এসে দেখি ও জল জল করে চেঁচাচ্ছে, আর আপনি রান্না নিয়ে ব্যস্ত, শুনতেই পাচ্ছে না। শুধু একটা র‍্যাপার গায়ে দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে…

কথাগুলো বলিতে বলিতে প্রতিভার পিছু পিছু সে ঘরের বাহিরে আসিল।

প্রতিভা হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, এত-সব ত' তোমার আমি জিজ্ঞাসা করি নি ঠাকুরপো!

বলিয়াই সে হরিহরকে অপ্রস্তুত করিয়া দিয়া এমন ভাবে হাসিতে লাগিল যে, হরিহরও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

হরিহর আবার বিবাহ করিল। এবার আর বড়লোকের মেয়ে নয় এবার গরীবের মেয়ে পারুল।

বিবাহের পূর্বে সে-কথা জানিবার সুযোগ বোঝাই যায় নাই। বিবাহের পর পারুলকে তাহার বাড়িতে লইয়া গিয়া দেখিল,মনের মত স্ত্রী পাইয়া এবার সত্যই সে সুখী হইয়াছে। পারুল যে শুধু সুন্দরী তাহা নয়, পারুলের গুন অনেক।

শ্বশুরবাড়ি আসিয়া অবধি একটি দণ্ডের জন্যও সে বসিয়া থাকে না। সংসারে যাবতীয় কাজকর্ম সে নিজের হাতে করে। ম্যালেরিয়া জ্বর তাহার সারিয়া গেছে। দেখিতে সে এখন আরও সুন্দরী হইয়াছে।

শাশুড়ীকে সে কিছুতেই রান্না করিতে দিবে না। পারুল বলে, না মা আমি নিজে রাঁধবো।

শাশুড়ী বলেন, সে কি মা। লোকে বলবে কি। বলবে ত্যাখো বৌটাকে নতুন এনেই হাঁড়ি ধরিয়েছে!

পারুল বলে, লোকের কথায় কান দিয়ো না মা। লোকে আবার ঠিক উল্টো কথাও বলতে জানে। তখন বলবে, ত্যাখো শাশুড়ী কাজ করে করে মরছে আর ব্যাটার বৌ পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে আছে!

শাশুড়ী হাসিয়া হরিহরের বাবাকে ডাকিয়া বলেন, ওগো শোনো, শোনো, বৌমার কথা শোনো!

হরিহর বলে, পারুল তোমার ভারি কষ্ট হচ্ছে; না?

পারুল হাসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, কেন গো, কষ্ট কেন হবে? এমন স্বামী যার তার আবার কষ্ট কিসের?

হরিহর বলে, আমাদের মাটির ঘর, আমরা গরীব······গরীবের ঘরে তোমায় মানায় না পারুল।

পারুল বলে ও-সব কথা বললে এবার কিন্তু আমি রাগ করবো। ত্যাখো, আমার বাবা আরও গরীব। দুবেলা পেট ভরে' কখনো খেতে পাই নি, ভাল কাপড় পরতে পাই নি, দিদি আমাকে সেইজন্যেই নিজের কাছে এনে রেখেছিল। তার তুলনায় যেন আমি স্বর্গে আছি গো!

হরিহর চুপ করিয়া কি যেন ভাবিল। ভাবিয়া বলিল, এমন দিন অবশ্য চিরকাল থাকবে না। আমি একটা কাজকর্ম জোগাড় করে' নিয়ে তোমাকে আমি খুব সুখে রাখবো।

পারুল বলিল, তুমি বিশ্বাস কর আমি খু—ব সুখে আছি।

তুমি কাছে থাকলে আমি গাছতলায় থাকতে পারি, উপোস দিয়ে থাকতে পারি।

হরিহর ঠিক যেমনটি চাহিয়াছিল তেমনিটি পাইয়াছে।

আনন্দে আত্মহারা হইয়া পারুলকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

তাহার পর সে কী তাহাদের আনন্দের হাসি! পারুলও যত হাসে, হরিহরও তত হাসে!

এমনি করিয়া হাসিয়া খেলিয়া পরমানন্দেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল।

তিনটি মাস তখনও পার হয় নাই। এমন দিনে বিনোদিনীর আসিয়া উপস্থিত।

স্বামী তাহার আবার বিবাহ করিয়াছে শুনিয়াই সে চলিয়া আসিয়াছে।

বাপের বাড়ি হইতে বরাবর মোটরে চড়িয়া সে শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছে। এ-গ্রামে মোটরগাড়ি একরকম আসে না বলিলেই হয়। কাজেই গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র গ্রামের আবালবৃদ্ধ বনিতা কতক-বা গাড়ি দেখিবার জন্য কতক্ বা মজা দেখিবার জন্য তখন ভিড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সকলেই দেখিল, গাড়ি হইতে বিনোদিনী নামিল,—সর্বাঙ্গে তাহার সোনার গহনা ঝল্‌মল্ সেদিন পরণে দামী বেনারসী শাড়ী, জিনিসপত্রে গাড়ি একেবারে ভর্ত্তি সঙ্গে একজন দাসীও আসিয়াছে।

শ্বশুর-শাশুড়িকে প্রণাম করিয়া বিনোদিনী ঘরে উঠিল।

দাসীটা অত্যন্ত মুখরা। বোধকরি মুখরা বলিয়াই তাহাকে সঙ্গে আনা হইয়াছে। দাসীর নাম মানদা। গায়ের রং কালো। বয়স বেশি নয়।

বাড়ীতে পা দিয়াই মানদা বলিল, জামাইবাবু কোথায় গো! আমাদের জামাইবাবু!

হরিহর ঘরেই ছিল। বাইরে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাবিয়াছিল মেয়েটাকে আচ্ছা করিয়া দু'-কথা শুনাইয়া দিবে। কিন্তু কি সর্বনাশ! কথা শুনাইবে কি, মেয়েটার মুখের সামনে দাঁড়ানোই দায়।

মানদা বলিল, বলি হ্যাঁগা জামাইবাবু, বৌ-এর গয়না বিক্রি করতে না পেলে কেউ যে আব'র বিয়ে করে, কই তা ত' শুনিনি কখনও!

হরিহর বুঝিল, কথাটা সেখানে এম্‌নি বিকৃত হইয়াই রটিয়াছে। মেয়েটার কথা শুনিয়া হরিহরে আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। মুখে শুধু এবার হুঁ বলিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মানদা বলিল, কই দেখি, কেমন বৌ হয়েছে দেখি একবার: আমাদের দিদিমণির সঙ্গে পাশাপাশি একবার দাঁড় করাও। দেখে চোখ জুড়াক। বাবুর বাড়ীতে বলবো গিয়ে!

এমনি-সব ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের চোখা চোখা বাণ যতগুলি তাহার তূণের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া ছিল সবই সে একে-একে হরিহরের পৃষ্ঠে নিক্ষেপ করিল। হরিহর কিন্তু জবাবে তাহার একটি কথাও বলিল না।

ওদিকে বিনোদিনীর ব্যবহার দেখিয়া সকলেই অবাক!

এমন ব্যবহার সে করিতে লাগিল যেন কতকালের পাকা গৃহিণী।

গরীবের সংসার। অভাব তাহাদের নিত্য লাগিয়াই আছে। বিনোদিনীই একে একে তাহা পূরণ করিতে লাগিল।

রান্না করিতেছিল পারুল। বিনোদিনী সেদিন গ্রামেরই এক বিধবা ব্রাহ্মণের মেয়েকে বলিল, কাল থেকে তুমিই আমাদের এখানে রান্না করবে, বুঝলে? খাওয়া-পরা বাদ চারটি করে টাকা দেবো।

পারুল ভয়ে-ভয়ে বিনোদিনীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কেন, আমিই ত' রান্না করছিলাম দিদি!

বিনোদিনী বলিল, না তোমাকে রান্না করতে হবে না। আমি বসে থাকবো আর তুমিই-বা কাজ করে মরবে কেন?

তাহার প্রতি যতীনের এই দয়া দেখিয়া পারুল অবাক হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

এমনি করিয়া ধীরে ধীরে দেখা গেল, বিনোদিনী তাহার টাকার জোরে, কতক-বা গায়ের জোরে সকলের কাছ হইতে সংসারের সব অধিকারই কাড়িয়া লইয়াছে।

বিনোদিনীর কল্যাণে সংসার এখন দিব্য সচ্ছল। অভাব অভিযোগের কথা শ্বশুর-শাশুড়ীকে আর শুনিতে হয় না! কাজেই বিনোদিনীকেও এখন কাহারও কিছুই বলিবার জো নাই।

রাত্রে সে হরিহরকে একা পাইয়া বলে ছি, ছি, পঞ্চাশটা টাকা না পেয়ে তুমি আবার বিয়ে করে বসলে?

হরিহর বলে, কি করবো বল। তোমার বাবা স্পষ্ট জবাব দিলেন। বললেন, গরীবের বাড়িতে মেয়ে আমি পাঠাবো না। তাই ভাবলাম তুমি আর কখনও আসবে না। তাছাড়া গয়না ত আমি তোমার কাছেই চেয়েছিলাম। তুমিও ত' দাওনি।

বিনোদিনী বলিল, এমন করবে জানলে নিশ্চয়ই দিতাম।

বিনোদিনীর এমন ব্যবহার হরিহর কিন্তু কোনও প্রকারেই সমর্থন করিতে পারিল না। পারুলকে সে সহজে তাহার স্বামীর কাছে আসিতে দিবে না।

হরিহর বলিল, এ তুমি বড় অন্যায় করছো বিনোদিনী। পারুল ত' কোনো দোষ করেনি, তবে তাকে তুমি এ শাস্তি কেন দিচ্ছ বল ত'?

বিনোদিনী বলে, তা' সতীনের ওপর যে মেয়ে পড়ে, তাকে শাস্তি একটুখানি পেতেই হয়।

হরিহর বলে, তা' বললে কি চলে বিনোদিনী, বেচারীকে দিনান্তেও একবার করে আমার কাছে আসতে দিয়ো।

বিনোদিনী বলে, না, তা আমি পারবো না। বুক আমার ফেটে যায়।

হরিহর অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই যখন তাহাকে রাজি করিতে পারে না, তখন একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখে। বলে, তুমি বড় আর ও ছোট। ছোট বলে ওকে একটুখানি অধিকার দাও।

বিনোদিনী বলে, না, তা আমি কিছুতেই পারবো না। দেখি, মনটাকে বুঝিয়ে যদি পারি।

বিনোদিনী তাহার মনটাকে বুঝাইতে থাকে, হরিহর সেই অবসরে একবার পারুলের কাছে গিয়া দাঁড়ায়। পারুল দু'হাত বাড়াইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া অপরিসীম নির্ভরতার তাহার বুকেই উপর মাথা রাখিয়া স্বামীর মুখের পানে একাগ্রদৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলে, আমার এ-ই ভালো। এই যে তোমাকে আমি পেয়েছি, এই যে বুঝিতে পারছি তুমি আমাকে ভালোবাসো,—এও আমার কম সৌভাগ্য নয়।

হরিহরের মুখ দিয়া আর কথা বাহির হয় না। এখানে আসিবার পূর্বে ভাবিয়াছিলাম, স্বামীকে না পাইবার জন্য পারুলও হয়ত তাহার কাছে নানান অভিযোগ করিবে, কিন্তু অভিযোগের একটি প্রকাণ্ড ফিরিস্তি তাহার কাছ হইতে না শুনিয়া হরিহরের বুকের ভিতরটা যেন বেদনায় ভারে আরও বেশি টন্ টন্ করিতে লাগিল, চোখদুটো তাহার কেমন যেন আপনা হইতেই জলে ভরিয়া আসিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া হরিহর কম্পিত কণ্ঠে কহিল, তুমি যে আমার সেই পারুল, তা আমি মুখে বলে কিছুতেই বুঝাতে পারবো না। কিন্তু তোমায় আমি বড় কষ্ট দিলাম।

পারুল তাহার স্বামীকে চিনিত। দুর্বল স্বামী মুখ ফুটিয়া বিনোদিনীকে কিছুই বলিতে পারে না। বলিলেও সে শোনে না। তাই সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিহরকে বলিল, এমনি করে লুকিয়ে-ছাপিয়েও তোমায় যদি আমি একবার করে পাই—তাহ'লেও জানবো, আমার মত সুখী আর কেউ নেই। তুমি কি বল,বেরক তোমার অবস্থা আমি জানি।—ওকি! তোমার চোখে জল!

অন্ধকারে মুখে হাত দিতে গিয়ে দেখে, হরিহরের চোখ দিয়া জল আসিয়াছে। বলিল, ছি, তুমি আমার জন্যে—

এমন সময় পিছন হইতে বিনোদিনী ডাকিল, ওগো শুনছো।

ঘন আলিঙ্গনাবদ্ধ চুম্বনরত পারুল কিম্বা হরিহর কেহই তাহার এ অপ্রত্যাশিত আগমন আশঙ্কা করে নাই। তৎক্ষণাৎ তাহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া।

পরদিন হইতে তাহাদের এ গোপন মিলনেরও বাধা পড়িল।

বিনোদিনীর সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ চক্ষু সর্বদাই হরিহরের অনুসরণ করিতে থাকে। পারুলের সঙ্গে কোনো প্রকারেই দেখা করিতে পারে না।

বিনোদিনী বলে, দেখা করেছ কি আমি কেলেঙ্কারীর কিছু বাকি রাখবো না।

হরিহর বলে, ছি ছি, এ তোমার ভারি অন্যায়।

বিনোদিনী বলে, হাঁ, অন্যায় বই-কি। তোমাদের দু'জনকে দিনরাত একা ছেড়ে দিই যদি, তা'হলে বড় ভাল হয়; না? কাজ নেই আমার সেরকম ভালোয়।

দু'-একবার লুকাইয়া লুকাইয়া দেখা, তাহাও যখন বন্ধ হইল, হরিহর তখন স্থির করিল, পারুলকে আবার তাহার দিদির কাছে রাখিয়া দিবে, এবং অন্য কোথাও বেড়াইতে যাইতেছে বলিয়া নির্মলের বাড়ি গিয়া ঢুকিলেই চলিবে।

প্রতিভার সঙ্গে দেখা করিয়া হরিহর একদিন তাহাকে রাজি করিয়া আসিল।

তাহার পর ভাল একটি দিন দেখিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া পারুল তাহার কাছে চলিয়া গেল।

কিন্তু হরিহর যাহা ভাবিয়া ছিল তাহা আর কিছুতেই হয় না।

নির্মলের বাড়ি যাইতে হইলে যে রাস্তা দিয়া যাইতে হয়, সেই রাস্তার দিকে তাকাইয়া বিনোদিনী চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া পাহারা দেয়। সেখানেও হরিহরকে সে যাইতে দিবে না।

হরিহর একদিন রাগিয়া বলিল, আমি এবার দেশ ছেড়ে কোথাও পালাবো বিনোদ।

বিনোদিনী রহস্য করিয়া বলিল, দেখো যেন পারুলকে নিয়ে পালিয়ো না।

তোমার ত' ওই পারুল আর পারুল। তার কাছে আমার একটি দিনের জন্যেও যেতে দিয়েছো?

বিনোদিনী বলিল, তাহলে আর পালাবার কথা বলতে না; না।

যাও। তোমার সঙ্গে আর পারি না আমি।

তা কেন পারবে। বলিয়া বিনোদিনী তাহার মুখেরপানে তাকাইয়া বড় আনন্দের হাসি হাসিতে লাগিল এ আনন্দ তাহার জয়ের আনন্দ!

কিন্তু হাসি দেখিয়া হরিহরে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। রাগিয়া বলিল, টাকা দিয়া তুমি নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে চাও, না? তা আর হবে না। কাল আমি চললাম কলকাতায়।

বিনোদিনী হাসিয়া বলিল, কলকাতায় গেলেই লোকের টাকার অভাব আর থাকে না। না?

হরিহর চুপ করিয়া রহিল।

বিনোদিনী বলিল, সেই যে পঞ্চাশ টাকার জন্যে চিঠি লিখেছিলে সেও ত' সেই কলকাতা থেকেই।

তখন আমি পড়তাম। এখন যাব চাকরি করতে।

আমাদের কাছারিতে একজন বি-এ পাশ ভদ্রলোক চাকরি করে। পঁচিশ টাকা মাইনে পায়।

হরিহর বলিল, তাহলে কি তোমার কাছে দিবারাত্রি বসে থাকতে বলছো?

বলছিই ত'। বলিয়া বিনোদিনী তাহার রাগ ভাঙাইবার জন্য হাতে ধরিয়া তাহাকে টানিয়া বসাইল।

সেদিন বৈকালে হরিহর তাহাদের বাড়ীর উঠানে বসিয়াছিল, ছোট একটা ছেলে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাহার হাতে একখানি চিঠি দিয়া গেল।

খুলিয়া দেখিল, চিঠিখানি, পারুলের দিদি প্রতিভার। লিখিয়াছে—

পারুলের এখন মন খুব খারাপ হইয়াছে তাহাকে একবার আমার মা'র কাছে পাঠাইতে চাই। তুমি একবার কয়েক মিনিটের জন্য আসিও। ইতি— তোমার বৌদি—প্রতিভা

কই দেখি কার চিঠি? বলিয়া পিছন দিক হইতে হাত বাড়াইয়া বিনোদিনী চিঠিখানি তাহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া কাড়িয়া লইয়া পড়িল। বলিল, এ আবার এক নতুন ফন্দী বুঝি? এই জন্যই কলকাতা যাব বলছিলে?

রাগে তখন হরিহরের কাঁদিবার মত অবস্থা।

হরিহরের মুখ দেখিয়া বিনোদিনী বোধকরি বুঝিল সে খাইয়াছে। বলিল, যাও একবার। কিন্তু আধঘণ্টার বেশি দেরি হয়েছে কি আমি গিয়ে হাজির হব, মনে থাকে যেন।

অনেক দিন পরে আজ পারুলকে সে একা পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। বলিল তোমাকে বিয়ে করে আমি শুধু কষ্টই দিলাম পারুল, সুখ তোমাকে একটি দিনের জন্যেও সুখ দিতে পারলাম না।

পারুল কিন্তু কোনও কথা না বলিয়া তাহার মুখের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

হরিহর বলিল, তাই যাও। মা'র কাছে গিয়ে কিছুদিন থেকে এসোগে।

পারুল বলিল, চিঠিপত্র দিও।

ঘাড় নাড়িয়া হরিহর বলিল, দেবো।

ভাবিল, এত কাছে থাকিয়াও একটি দিনের জন্য তাহাদের দেখাসাক্ষাৎ যখন হয় না, তাহার চেয়ে দূরে থাকাই ভালো।

হরিহর বলিল, বেশিদিন থেকো না সেখানে।

পারুল আবার সকরুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। সে চাহনির অর্থ যে হরিহর বুঝিল না তাহা নয়। বলিল, এখানে থাকলে তবু একবার চোখেও দেখতে পাব……

আর কিছু সে বলিতে পারিল না।

পারুল বলিল, যখন আসতে বলবে তখনই আসব।

তাহার পর সুখ-দুঃখের অনেক কথা কহিয়া আধ ঘণ্টার জায়গায় দু'ঘণ্টা কাটাইয়া হরিহর বাড়ী ফিরিল।

পারুল তাহার মার কাছে চলিয়া গিয়াছে।

গিয়াই চিঠি লিখবে বলিয়াছিল, কিন্তু একমাস গত হইল এখনও তাহার একখানিও চিঠি আসে নাই।

মাস দেড়েক পরে একখানি চিঠি আসিল। প্রকাণ্ড চিঠি। বিনাইয়া বিনাইয়া বহুদিন ধরিয়া অনেক দুঃখের কথাই লিখিয়াছে। সর্ব্বশেষে জানাইয়াছে আমার আবার অসুখ করিতেছে। একবার যদি এখানে আসিতে পারো ত' বড় ভাল হয়। আমি বোধহয় আর বেশী দিন বাঁচিব না।

চিঠির কথা হরিহর বিনোদিনীকে জানাইল না। শুধু বলিল, এরকম করে কতদিন আর বাড়ীতে বসে থাকব বল ত'? আমি একবার কলকাতায় যাই, কাজকর্মের চেষ্টা দেখিগে।

কিন্তু বিনোদিনীর ধারণা, কলিকাতা সে যাইবে না। কলিকাতা যাইবার নাম করিয়া হয়ত সে পারুলের কাছে গিয়া বসিয়া থাকবে। বলিল, আমি যখন আর চালাতে পারব না তখন যেয়ো।

হরিহর বলিল, তোমার পুঁজি ত মোটে এক হাজার টাকা। তাও ত' শেষ হতে বসেছে। আর তাছাড়া পুরুষ মানুষকে রোজগার করতে দেবে না এত' ভারি মজা দেখছি।

বিনোদিনী বলিল, এখনও আমার হাজার-পাঁচেক টাকার গয়না আছে। যাক না গয়না-টাকা। আমার তুমি গেলেই ভয়।

বিনোদিনী কিছুতেই যাইতে দেয় না। হরিহরও যাইবার জন্য ছল-ছুতা খুঁজিয়া ফেরে।

অবশেষে অনেক কষ্টে অনেক বুঝাইয়া বিনোদিনীকে একদিন সে রাজি করিল।

রাজি করিল এই বলিয়া যে সে কলিকাতায় গিয়া এম-এ পরীক্ষা দিবে।

যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া সে একবার প্রতিভার সঙ্গে দেখা করিতে গেল, পারুলকে চিঠিপত্র যদি সে কিছু দেয় ত' তাহাই লইয়া যাইবার জন্য।

কিন্তু তাহাদের বাড়ী ঢুকিয়াই দেখল ঘরের মেঝের উপর প্রতিভা উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে।

হরিহর ডাকিল বৌদি।

প্রতিভা সাড়া দিল না। হরিহর আবার বলিল, আমি পারুলের কাছে যাচ্ছি বৌদি।

হ্যাঁ যাও। বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রতিভা উঠিয়া বসিল। তাহার পর তাহার হাতের মুঠোর মধ্যে পোষ্টকার্ডে লেখা যে চিঠিখানি সে চাপিয়া ধরিয়া ছিল সেইখানি হরিহরের গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, পড়ে ছাখ?

চিঠিখানি পড়িতে পড়িতে হরিহর থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। চিঠিখানি লিখিয়াছেন প্রতিভার বাবা।

লিখিয়াছেন ঃ

গত রবিবার সকালে পারুল মরিয়া গেছে।

কেমন করিয়া হরিহর যে বাড়ী ফিরিয়া আসিল তাহা একমাত্র সে-ই জানে।

তাহাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, ফিরে এলে যে?

হরিহরের চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। থর থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পোষ্টকার্ডের চিঠিখানি বিনোদিনীর হাতে দিয়া বলিল, তোমাকে ছেড়ে আর আমি কোথাও যাব না বিনোদিনী, যাওয়ার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে।

বলিতে বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল।

সরযূকে আজ দেখিতে আসিবে।

মা সকাল হইতে তাড়া দিতেছেন গা-হাত ধুইবার জন্য। ভালরূপ সাজিয়া গুজিয়া না দেখাইলে পোড়ার মুখ লোকের কি আর পছন্দ হয়! যদিও সরযূর চেহারা পাড়ার অন্য পাঁচটা মেয়ে অপেক্ষা ভালই এবং স্বাস্থ্যও তাহার দেখিবার মত, তথাপি মা'য় সর্ব্বদা ভয় হইতেছে, যদি তাহারা পছন্দ না করে!

পছন্দ করিবার জন্য মা বাবা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন এত দিন। বাবা কেরাণী হইয়াও বহু কষ্টার্জিত অর্থে তাহাকে ম্যাট্রিক পাশ করাইয়াছেন, সেলাই, বুনন শেখাইয়াছেন, গানও শেখাইবার ব্যবস্থার ক্রটি করেন নাই, কিন্তু গলা ভাল না থাকায় সরযূর গান শেখা হইল না। তাই তাহার বাবা আল্পনা ও চিত্রাঙ্কণ কার্যে তাহাকে দক্ষ করিয়া তাহার কলানুরাগিতা প্রমাণের জন্য আজ সাত মাস হইতে এক আর্টিষ্ট টিচার পুষিতেছেন।

ওদিকে মায়ের যত্নেরও ক্রটি নাই, তিনি চপ্ কাটলেট কালিয়া হইতে পোলাও কোর্ম্মা সবই মেয়েকে রাঁধিতে শিখাইয়াছেন। এই শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে বাপকে কম কষ্টটা ভোগ করিতে হয় নাই, এবং প্রথম প্রথম সরযূর অপটু হাতের কদর্য রান্না খাইয়াও তাহাকে প্রশংসা করিয়া উৎসাহ দিতে হইয়াছে। সেই সরযূর সমস্ত শিক্ষার আজ পরীক্ষা।

বেলা তিনটা বাজিয়া গেল। চারটার সময় তাঁহারা আসিবেন। সরযূ যে এখনো ঘরের ভিতর বসিয়া আছে! আশ্চর্য! মা চীৎকার করিয়া বলিলেন—ও সরযূ, উঠে আয় না মা, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে যে এসে পড়বে সব। আচ্ছা মেয়ে বাপু তোরা হয়েছিস।

সরযূ কোনদিন কারো কথায় প্রতিবাদ করে নাই; আজও করিল না। গা ধুইয়া পোষাকী কাপড়-চোপড় পরিয়া পটের ছবিটি সাজিয়া সে বসিয়া রহিল। মা তাহাকে পাড়ার পাঁচজনের নিকট হইতে

চাহিয়া চিন্তিয়া যতগুলি গহনা পরাইয়া দিয়াছেন, সবই সরযু নির্বিবাদে পরিয়া আছে। সকলেই বলিল—কী লক্ষ্মী মেয়ে। একে কি কেউ পছন্দ না করে পারে!

মেয়ে কিন্তু ভাবিতেছে—পছন্দ না করিলেই যেন সে বাঁচিয়া যায়! তাহার ষোড়শ বৎসরের মুক্ত কৌমার্যকে ইহারা কেন যে বিবাহের শৃঙ্খলে বাঁধিয়া ফেলিতে চাহিতেছে! তবুও সরযু প্রতিবাদ করিল না। প্রতিবাদ করা তাহার স্বভাবে নাই।

কন্যা পছন্দ হইল এবং বিবাহ হইয়া গেল। যাহার সহিত বিবাহ হইল সে মানুষটি নাকি কলেজে পড়িতেছে। সরযু তখনো তাহাকে ভাল করিয়া দেখে নাই। আজই উহার সহিত গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় তাহাকে চিরপরিচিত কলিকাতা ছাড়িয়া যাইতে হইবে পশ্চিমবঙ্গের কোন এক অখ্যাত পল্লীতে। সেখানেই উহাদের পৈত্রিক ভিটা। সরযুর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। পাড়াগায়ে সে কখনো যায় নাই—সেখানকার মশা-ম্যালেরিয়ার সঙ্গে ভূত শাঁকচুন্নির কথা সে পুস্তকে পড়িয়াছে, এবং পড়িয়া পড়িয়া তাহার মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা জন্মিয়াছে যে, কাব্যে এবং উপন্যাসে পল্লীর অতি লোভনীয় চিত্র থাকিলেও মশা, ম্যালেরিয়ার সঙ্গে সাপ, বাঘ, শাঁখচুন্নির অভাব নাই। তবু তাহাকে সেখানে যাইতে হইবে। সরযু এবারও কোন কথা বলিল না, নীরবে স্বামীর অনুগমন করিল।

স্টেশন হইতে ক্রোশখানেক পাল্কীতে চাপিয়া আসিয়া পৌছিল শ্বশুর বাড়িতে। বিরাট এক প্রাসাদ—ইট, সুরকী খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। পশ্চিমদিকের একটা প্রান্ত কবে কোন দুর্যোগ রজনীতে ধ্বসিয়া পড়িয়া বহু পুরাতন যুগের স্তূপের মত দেখাইতেছে।

অন্তঃপুর-সংলগ্ন বিশাল পুষ্করিণীর চতুষ্পার্শে সুবিস্তৃত আম্রকানন পুরাকালের তপোবনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সরযু চাহিয়া নির্বাক বিস্ময়ে সমস্ত দেখিল। দেখিয়া দেখিয়া মন তাহার আতঙ্কে অভিভূত হইয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই—তাহাকে এই ক্ষুধিত

পাষাণের বক্ষপঞ্জরেই শৃঙ্খলিত থাকিতে হইবে। বুক ভাঙ্গিয়া তাহার একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল।

রাত্রে সরযুকে যে ঘরে শয়নকক্ষীতে দেওয়া হইল সে ঘরের বিপুলায়তন রূপ মানুষের মনকে আতঙ্কিত করে। প্রকাণ্ড ঘরটার একপার্শ্বে একটা বহু পুরাতন পালঙ্কে তাহার শয্যা পাতা। দুই একটা কাঠের চেয়ার ও একটা মর্মর বেদী ছাড়া ঘরটায় আর কোন আসবাব নাই। স্বামী তখনো আসেন নাই। সরযূ একটা চেয়ারে বসিয়া বসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল একটা ছোট ননদও নাই বাড়ীতে যে তাহার কাছে এই সময়টা একটু বসিয়া গল্প করে। ঝি আছে, কিন্তু সে দূরে কোথায় বসিয়া আছে, হয়ত ঘুমে ঢুলিতেছে। সরযূ তাহাকে ডাকিতে লজ্জা বোধ করিল। সে উঠিয়া একটা জানলা খুলিয়া দিল। অন্তঃপুরের পশ্চাতে সুবৃহৎ পুষ্করিণী এবং তৎসংলগ্ন বাগান। রাত্রের তরল অন্ধকারে সে বাগান যেন অরণ্যের মত মনে হইতেছে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকিতেছে—সরযূ এ-ডাক পূর্বে শোনে নাই। তাহার কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল।

কিন্তু এরূপ নিস্তব্ধতার মধ্যে মানুষ কতক্ষণ অবস্থান করিতে পারে। সরযূর ক্লান্তিবোধ হইতে লাগিল। স্বামীর উপর একটু রাগও যে না হইতেছিল তাহা নয়। নবপরিণীতা বধূকে এমনভাবে একা রাখিয়া যে স্বামী বাহিরে থাকিতে পারে তাহার সহিত সমস্ত জীবনটা কাটান বড় সোজা নয় —নিশ্চয়ই।

পশ্চাতে দরজা খোলার শব্দে সরযূ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল অরুণ। আনন্দে তাহার মুখ দীপ্ত হইয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত হইয়া সে স্বামীর কাছে আনন্দে আসিয়া বলিল—কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?

অরুণ তাহাকে আদর করিয়া বলিল, খুব রাত হ'য়ে গেছে, না ? তোমার ভয় ক'রছিল ?—

—না—খুব ভালই লাগছিল—শুধু একা, তাই—

—ভয় ক'রেনি তো ? খুব সাহস তো তোমার ?

—হাঁ, কিন্তু কোথায় ছিলে তুমি ? বলো !

অরুণ তাহাকে সস্নেহে কাছে টানিয়া বলিল, সন্দেহ হয় নাকি ? ভয় নাই, বাইরের ঘরে বসেছিলুম। রোজ সেখানে গান বাজনার আসর বসে কি না —আমি তো বাড়িতে থাকি না, যখন থাকি একটু না গেলে সবাই ক্ষুণ্ণ হয়।

সরযূ আর কিছু বলিল না। অরুণ তাহাকে টানিয়া লইয়া জানালার কাছে দাঁড়াইল। এতক্ষণে চাঁদ উঠিয়াছে, পুকুরের কালো জলের ছোট ছোট ঢেউগুলিতে চন্দ্রবিম্ব নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিতেছে। ওপারে আম বাগানের বৃহৎ বৃক্ষের ফাঁকেফাঁকে চন্দ্রালোক পড়িয়াসমস্ত বাগান যেন স্বপ্নদৃষ্ট মায়ালোকেরন্যায় প্রতিভাত হইছে।

অরুণ সেইদিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, জানো সরযূ, এই আমবাগান আমার ঠাকুরদার হাতের তৈরী। ঠাকুরদাই এ বাড়ি-ঘর সব করেছিলেন কি না। তাঁরই নক্সা অনুযায়ী এই বাড়ি। তুমি এখনো সবটা দেখনি বোধ হয়—না ?

সরযূ জানাইল যে, সে দেখে নাই। অরুণ বলিয়া চলিল, পশ্চিম দিকের যে ঘরগুলো ধ্বসে পড়েছে, ঐগুলোই ছিল ঠাকুরদার ধনাগার। সে ধন কি অল্প স্বল্প! শুনেছি, সাত শো পিতলের কলসীতে সেই বিপুল ধনরাশি স্বর্ণ মুদ্রাকরে রক্ষিত ছিল। ঠাকুরদা কাউকে সে টাকার একটিও ছুঁতে দিতেননা। তিনি নাকি শেষটায় সেই টাকাগুলো ভালভাবে রাখবার জন্য ঐ পশ্চিম দিকের কোন একটা কুঠরীতে রেখে একজন যক্ষকে তার রক্ষক নিযুক্ত করেন ; সেই নাকি এখনো সেই টাকাগুলোকে পাহারা দেয়।

যক্ষের নামে সরযূরকেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু জানিবার আগ্রহও তাহার কম নয়। তাই সে অরুণের আরো কাছে সরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,— যক্ষ কি,— ভূত ?

—ননা, হাঁ, ভূতই বলা যায়। শুনেছি একটা ঘরে সমস্ত টাকাগুলো কলসীতে কলসীতে সাজিয়ে রেখে একটি ছোট ছেলেকে নূতন কাপড়

পরিয়ে, চন্দন, তিলক দিয়ে সাজিয়ে সেই ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়। ছেলেটিকে ঘরে রাখবার সময় সে খাবার ইত্যাদি দেওয়া হয় তাতে যে কদিন চলে—চলে! তারপর ছেলেটি মরে ভূত হয়ে সেই ঘরে থাকে আর টাকাগুলোকে পাহারা দেয়।

স্বামীর মুখে এই গল্প শুনিতে শুনিতে বারংবার সরযুর বুক কাঁপিয়া উঠিতেছিল, তবুও তাহাকে যেন সেকথা শুনিতেই হইবে। সে এবার চীৎকার করিয়া উঠিল—মাগো; না, খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে!

অরুণ তাহাকে বাকী গল্পটা হয়ত আর বলিত না, কিন্তু সর। তাকে খোঁচাইয়া, আব্দার করিয়া সবটা শুনিল এবং আরও শুনিল যে, তাহাদের সেই ঠাকুরদা এই বংশের পরবর্তী কোন পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তাহার পূর্বে কেহই ওই ধনরাশি আয়ত্তে আনিতে পারিবে না। কারণ সেই মৃত ছেলেটি এখন যক্ষ হইয়া ধনভাণ্ডার পাহারা দিতেছে। অরুণের পিতা একবার সেই গুপ্ত ধন উদ্ধার করিবার চেষ্টা করায় সেই যক্ষ নাকি ক্রমাগত কয়েকদিন ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদির সৃষ্টি করিয়া অট্টালিকার পশ্চিমাংশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করিয়া গিয়াছে। তদবধি ভয়ে আর কেহ কোন চেষ্টা করে নাই।

সরযু ভয়ে ভয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, ঠাকুরদা কতদিন পরে জন্মাবেন?

তাতো কিছু তিনি বলেননি তোমার ছেলে হয়েও জন্মাতে পারেন।

—আমার ছেলে হয়ে—।

সরযু শিহরিয়া উঠিল। সেই নিষ্ঠুর লোক—যে ধনভাণ্ডারের রক্ষক নিযুক্ত করিবার জন্য পরের ছেলেকে না খাইতে দিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে তাহার মা হইতে সরযুর কোথায় যেন বাধিতেছে; না, সরযু তাহার মা হইতে চাহে না। সরযুর গর্ভে যে জন্মিবে, সে যেন ঐরূপ নিষ্ঠুর না হয়। কিন্তু এত কথা স্বামীকে সে বলিতে পারে না। তাঁহার সহরের আবহাওয়ায় তরুণ মনে স্বামীর কাছে সব কিছু বলিবার মত প্রসারতা থাকিলেও সন্তানের কথা বলিবার মত জোর

নাই। সরযু চুপ করিয়া রহিল। অরুণ কিন্তু বলিয়া বসিল—তা' হ'লে কিন্তু বেশ হয় সরযু। বাবা অনেক দেনাপত্র করে ফেলেখেন, সেগুলো শোধ দিয়ে আর একবার চাটুজ্যে গোষ্ঠী মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

সরযু স্বামীর কথা শুনিয়া হাঁ না কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার মনে তখন সেই যক্ষরূপী জাগিয়া উঠিয়াছে; নারীর মধ্যে যে সুপ্ত মাতৃত্ব থাকে তাহাই যেন সরযুর সমস্ত অন্তরকে নাড়াদিয়া কাঁদিয়া উঠীল,—যেন সরযুর আপন সন্তান অনাহারে কোথায় বন্দী।

সরযু অরুণকে ধরিয়া বসিল—আমায় দেখাবে, কোন দিকে সেই ধনাগারগুলো ?

—এসো-না—এই দিকের বারান্দা থেকেই তো দেখা যায়, বলিয়া অরুণ তাহাকে লইয়া পশ্চিমের একটা দরজা খুলিয়া খোলা বারান্দায় আসিল। উপরে আকাশ; বারান্দার আলিশায় ভর দিয়া সরযু নীচে তাকাইয়া দেখিল, বিরাট ধ্বংসস্তূপ, চন্দ্রালোকে ভাল দেখা যায় না —তবুও ঐ পর্বতের মত ইষ্টকরাশিতে যে রহস্য লুকায়িত আছে, তাহার স্মৃতি সরযুকে অভিভূত আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। ভয়ে সে চোখ বুঁজিয়া স্বামীর বাহু অবলম্বন করিয়া বলিল—চলো ঘরে যাই।

* * *

সরযুর দিন মন্দ কাটিতেছিল না—শুধু রাত্রে যতক্ষণ অরুণ না আসে ততক্ষণ তার কেমন যেন ভয় করে। ভীষণ গরম বোধ হইলেও সে পশ্চিমের দরজা বা জানালা খুলিতে সাহস করে না। এমন কি দক্ষিণ দিকের শেষ জানালাটা হইতে পশ্চিমের ধ্বংসাবশেষ খানিকটা দেখা যায়, তাই সে জানালাটাও বন্ধই রাখিয়া দেয়। অরুণ আসিয়া বলে, গরমে ঘামছো কেন? জানালা খুলতে পারনি —? সরযু চুপ করিয়া থাকে। অরুণ জানালা খুলিয়া দেয়। মন্দ মন্দ দক্ষিণ হাওয়া আসিযা সরযুর ঘর্মাক্ত দেহ শীতল করিয়া দেয়, তথাপি সরযুর মনে হয়, এই হাওয়া যেন কোনো শিশুর কাতর দীর্ঘশ্বাস, যেন কাহারনিষ্ঠুরতার ক্ষমাহীন ইতিহাস। মনের কথা সরযু অরুণকে বলিতে

পারে না, কিন্তু অনেকবার তাহার মনে হয় এ ঘরটা তাহা.দর শয়ন গৃহ না হইলেই ভাল হইত। অরুণ কিন্তু এই ঘরটিকেই বেশী পছন্দ করে। গভীর রাত্রে সে উঠিয়া কতদিন পশ্চিমের জানালার কাছে গিয়া ধ্বংসস্তূপের দিকে চাহিয়া থাকে। অকস্মাৎ ঘুম ভাঙিয়া কতদনি সরযূ স্বামীকে এ অবস্থায় দেখিয়াছে; আস্তে আস্তে তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছে—কি দেখছো? অরুণ হাসিয়া জবাব দিয়াছে—দেখছি, ঠাকুরদার। আসতে আর কত দেরী।

সরযূ বলে—তা' দেখে কি হবে?

অরুণ বলে ঠাকুরদা যে তোমারই কোলে আসবে সরযূ তা' জান?

—না, তুমি কেমন করে জানলে?

—আমার বিশ্বাস, আর আমি তাই চাই। তুমি চাও না?

—না, ওরকম নিষ্ঠুর ছেলে আমার চাই না।

অরুণ আহত হইল, তথাপি সরযূকে বলিল—না, নিষ্ঠুর কেন হবে। আর তুমি কি পাগল হয়েছ সরযূ, ঐসব যক্ষ ইত্যাদির কথা কি বিশ্বাস করে মানুষে। আমার এই পশ্চিম দিক্‌টা, জানি না কেন, খুব ভাল লাগে—তাই দাঁড়িয়ে আছি। চলো, শুইগে।

অরুণ কথাটা চাপিয়া যায়। সরযূর আবাল্য অর্জিত শিক্ষাদীক্ষাকে আঘাত দিতে সে চায় না, কিন্তু অরুণের মনের অবস্থাটা সরযূ যেন বুঝিতে পারে। সরযূ মনে করে, স্বামী চান তাঁহার ঠাকুরদাকে ফিরিয়া পাইতে তাঁহার পুত্ররূপে—কিন্তু সরযূ স্বামীর এই ইচ্ছাকে কিছুতেই সমর্থন করিতে পারে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ সম্বন্ধে কথার আদান-প্রদান কোন দিন হয় নাই, হইলে হয়ত কিছু ভাল ফল হইত কিন্তু সরযূ নিজের গোপন মনের কথাটা নিজের কাছেই স্বীকার করিয়া লজ্জিত হয়।

কিন্তু একদিন সত্যই আবিষ্কৃত হইল যে, সরযূর মা হইবার অবস্থা হইয়াছে। সরযূ যেদিন ইহা জানিল সেদিন সে আনন্দে আত্মহারা হইলেও কোথায় যেন একটা দুশ্চিন্তা তাহাকে কাঁটার মত খোঁচা দিতে

লাগিল। তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল যে, যে-যক্ষকে তাহাদের ঠাকুরদা ঘরের ভিতর বন্দী করিয়া হত্যা করিয়াছেন সেই যক্ষই যেন সেই ঠাকুরদার আত্মাকে ফিরাইয়া সরযুর গর্ভে বন্দী করিয়াছে। এই বন্দিত্ব হইতে ঠাকুরদার আর মুক্তি নাই। ইহা যেন সেই যক্ষের কঠোর প্রতিশোধ।

এই চিন্তাটা সরযুর মনের মধ্যে যত বেশী প্রভাব বিস্তার করিতে লাগল সরযু ততই ভীত হইয়া উঠিতে লাগিল, শেষে সে একদিন হইয়া পড়িল। অনেক ভাবিয়া সে সরযুকে বাপের বাড়ি পাঠাইয়া দিল।

শ্বশুরবাড়ি হইতে দূরে আসিয়া সরযুর মন অনেকখানি শান্ত হইলেও তাহার ভয় সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল না। স্বপ্নের ঘোরেও তাহার মনে হইত, সেই যক্ষটা যেন তাহার সন্তানকে তাহার গর্ভ হইতে জীবন্ত বাহিরে আ সতে দিতেছে না।

সরযু স্বপ্নোঘোরে কাঁদিয়া উঠে। তাহার মা একদিন সমস্ত শুনিয়া ভাল ডাক্তার আনাইলেন। চিকিৎসা চলিতে লাগিল, কিন্তু সরযুর সারিবার লক্ষণ দেখা গেল না।

*　　*　　*

সেদিন সন্ধ্যা হইতেই বৃষ্টি পড়িতেছিল। ঘোর অন্ধকার এবং জোর বাতাস বহিতেছে। সরযু নিজের ঘরে খাটে শুইয়া আছে, খাটের নীচের বাড়ির ঝি নাসিকাধ্বনি করিয়া ঘুমাইতেছে। হঠাৎ কোথায় কোনো একটা কিছু পতনের শব্দ হইল। সরযুর সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ভয়ে সে একটু শব্দও বাহির করিতে পারিল না। তাহার কেবল মনে হইতে লাগিল—আজই বুঝি সেই যক্ষটার সঙ্গে তাহাদের ঠাকুরদায় সংগ্রামের দিন। আজই ঠাকুরদা যেন কিছুতেই বাহিরে আসিতে দিতেছে না· যক্ষটা যেন বলিতেছে সাবধান বাহির হইতে চেষ্টা করিলেই মারিয়া ফেলিব। অনুভূত যন্ত্রণার সরযুর সর্ব্বাঙ্গ অভিভূত হইয়া গেল।

আতঙ্কে সরযু চক্ষু মুদ্রিত করিল—ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞান লোপ পাইতেছে।